প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- **আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব**
  মোহাম্মাদ আলী সোমালী
- **কুরআনের সাক্ষ্য : মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি**
- **মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ নিষ্পাপত্বের দলিলসমূহের পর্যালোচনা**
- **হজের দর্শন ও শিক্ষা**
  ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান
- **ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ**
  শের কাভান্দ
- **ইসলামের নারীর অধিকার**
  আয়াতুল্লাহ ইবরাহীম আমিনী
- **ইমাম আলী (আ.) এর কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা**
- **ইমাম হাসান (আ.) ও তাঁর সন্ধিচুক্তি**
  আয়াতুল্লাহ আলী কারিমী জাহরুমী
- **উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (আ.)**
  নূর হোসাইন মজিদি
- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী**
  মুহাম্মাদ আলী চানারানী
- **আপনার জিজ্ঞাসা**

বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩-৪, অক্টোবর ২০১৬ - মার্চ ২০১৭

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩-৪

অক্টোবর ২০১৬ - মার্চ ২০১৭

সম্পাদক : **এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : কার্তিক - চৈত্র ১৪২৩

যিলহজ ১৪৩৭ - জমাদিউস সানি ১৪৩৮

মূল্য : ১০০ (একশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : বাড়ি # বি-২, ফ্ল্যাট # ৫০২,

মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৯১২১৪৫৯৬৫

Prottasha (Vol. 6, No. 3-4, October 2016 - March 2017), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman;

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

  ইসলাম : শান্তি ও ন্যায়ের বার্তাবাহক ৭

- **নীতি-নৈতিকতা**

  আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ১৩

  মোহাম্মাদ আলী সোমালী

- **ধর্ম ও দর্শন**

  কুরআনের সাক্ষ্য : মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি ২৭

  সংকলন : রায়হানুল ইসলাম

  মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ নিষ্পাপত্বের দলিলসমূহের পর্যালোচনা ৩৭

  হজের দর্শন ও শিক্ষা ৫২

  ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান

  ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ৬৬

  শের কাভান্দ

  ইসলামের নারীর অধিকার ৭০

  আয়াতুল্লাহ ইবরাহীম আমিনী

  ইমাম আলী (আ.) এর কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা ৮৭

- **বিশেষ প্রবন্ধ**

  ইমাম হাসান (আ.) ও তাঁর সন্ধিচুক্তি ১০৫

  আয়াতুল্লাহ আলী কারিমী জাহরুমী

- **জীবনী**

  উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (আ.)

  নূর হোসাইন মজিদি ১২৩

  রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী ১৩০

  মুহাম্মাদ আলী চানারানী

- **আপনার জিজ্ঞাসা** ১৪৭

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 6, No. 3-4, October 2016 - March 2017

Table of Contents

- **Editorial**
  - **Islam: Messenger of Peace and Justice** **7**
- **Ethics**
  - **Significance of Self-Control and Self-Purification** **13**
    Dr. Mohammad Ali Shomali
- **Theology and Philosophy**
  - **Man, Representative of Allah** **27**
    Compilation: Raihanul Islam
  - **A Discussion on Infallibility of Prophet (Sm.)** **37**
  - **Philosophy of Hajj and It's Teachings** **52**
    Dr. Maolana A.K.M. Mahbubur Rahman
  - **Cultural Values of Islam** **66**
    Sher Kavand
  - **Women's Right is Islam** **70**
    Ayatollah Ibrahim Amini
  - **Explanation of Some Brief Speech of Ali (A.)** **87**
- **Special Article**
  - **Imam Hasan (A.) & His Negotiation Treaty** **105**
    Ayatollah Ali Karimi Jahrumi
- **Biography**
  - **Ummul Mumineen Hazrat Khadiza (A.)** **123**
    Nur Hossain Mazidi
  - **Some Sincere Young Companions of Prophet (Sm.)** **130**
    Muhammad Ali Chanarani
- **Your Question** **147**

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	১২০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-বি-২ ফ্লাট-৫০২, মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

ইসলাম : শান্তি ও ন্যায়ের বার্তাবাহক

সম্পাদকীয়

ইসলাম : শান্তি ও ন্যায়ের বার্তাবাহক

পবিত্র কোরআন বারবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছে যে, ইসলাম শান্তি, সন্ধি ও সম্প্রীতির ধর্ম। এ ঐশী গ্রন্থে 'সুল্হ' (সন্ধি) ও 'সিল্ম' (শান্তি) শব্দ দুটি অনেকবার এসেছে যা গভীর গুরুত্বপূর্ণ এক অর্থ বহন করে। আভিধানিক অর্থে 'সিল্ম' শব্দের অর্থ বাহ্যিক (শারীরিক) ও অভ্যন্তরীণ (মানসিক) উভয় দিক থেকে সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকা। যেমন বলা হয়েছে : 'যখন ইবরাহিম তার প্রভুর নিকট পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হলো।' (সাফফাত : ৮৪) তেমনি অন্যত্র বলা হয়েছে : 'হে যারা ঈমান এনেছ, সমবেতভাবে শান্তির মধ্যে প্রবেশ কর।' (বাকারা : ২০৮) কখনও কখনও কোরআনে সিল্ম শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন : 'তারা (শত্রুপক্ষ) যদি সন্ধির জন্য প্রস্তাব দেয়, তবে তোমরাও তা মেনে নাও।' (আনফাল : ৬১) এবং 'সুতরাং তারা যদি ... তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের ওপর (আক্রমণের) কোন পথ রাখেন নি।' (নিসা : ৯০) এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়, যে কেউই মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে চায়–যদিও সে ইতিপূর্বে ইসলামের শত্রু হয়ে থাকে ও যুদ্ধ করে থাকে–ইসলাম তাদের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। এমনকি মহান আল্লাহ এমন সম্প্রদায়ের প্রতিও অবিচার ও সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন যারা মুসলমানদের মক্কায় হজে যেতে বাধা প্রদান করেছে। কোরআন বলছে : '(সাবধান!) কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ–এজন্য যে, তারা তোমাদের সম্মানিত মসজিদে (কা'বাঘরে) যেতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে–যেন তোমাদের অবিচার ও সীমা লঙ্ঘন করতে উদ্যোগী না করে।' (মায়িদা : ২)

পবিত্র কোরআন আহলে কিতাবদের সাথে যেহেতু কিছু মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে এটিকে ঐক্যের মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করে বলছে : "(হে নবি) আপনি (আহলে কিতাবদের) বলুন, 'হে গ্রন্থধারীরা! এস, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক অভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে আসি, আর তা এই যে, আল্লাহ ব্যতীত

অন্য কারও উপাসনা করব না, কোন কিছুকে তাঁর অংশী করব না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেউ অপর কাউকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ না করে।" (আলে ইমরান : ৬৪) এটা এজন্য যে, কোরআন সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও সুন্দর সম্পর্ককে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলে মনে করে। তাই কোরআন বলছে : 'আপোস ও মীমাংসাই উত্তম।' (নিসা : ১২৮) ইসলাম সকল মানুষের সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়ে বলছে : 'মানুষের সাথে উত্তমরূপে কথা বল।' (বাকারা : ৮৩) এক্ষেত্রে কোন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও জাতির ভেদ রাখে নি। ইসলাম সকল মানুষের আমানত রক্ষা করাকে অপরিহার্য জ্ঞান করে। মহানবী (সা.) এ নীতিটি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়ার সময় সকল মুশরিকের যা কিছু সম্পদ তাঁর নিকট আমানত হিসেবে গচ্ছিত ছিল হযরত আলীর কাছে বুঝিয়ে দিয়ে যান, যাতে তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। এটি একটি বিরল শিক্ষণীয় ঘটনা যে, যে শত্রুরা তাঁকে তাঁর জন্মভূমি থেকে বের করে দিয়েছে ও তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে (আনফাল : ৩০) তিনি তাদের সম্পদ ও অর্থকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পদক্ষেপ নিয়ে তারপর জন্মভূমি ত্যাগ করছেন।

সুতরাং ইসলাম ও কোরআন বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং সকল মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায়। এটি এজন্য যে, সকল মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান হিসেবে মহান আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন : 'নিশ্চয় আমি আদমের সন্তানদের সম্মানিত করেছি।' (বনি ইসরাঈল : ৭০) তাই কোরআনের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষের সাথে নৈতিক আচরণ করা, এমনকি যদি সে অবিশ্বাসীও হয়। তবে শর্ত হলো তারাও যেন এ মৌল নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ মূলনীতিটি পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদের বাসভূমি হতে তোমাদের বহিষ্কার করে নি তাদের প্রতি কল্যাণ (উদারতা প্রদর্শন) ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না; নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তো কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন থেকে তোমাদের নিষেধ করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের বাসভূমি হতে তোমাদের বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে (অন্যকে) সাহায্য করেছে; তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে প্রকৃতপক্ষে তারাই অবিচারক।' (মুমতাহিনাহ : ৮-৯)

ইসলাম নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণের নির্দেশ দেয়। এ বিষয়ে কোরআন বলছে : 'যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার করবে।' (নিসা : ৫৮) মানবগোষ্ঠীর কারো প্রতি যেন অবিচার না করা হয় তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে : 'হে বিশ্বাসিগণ! কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরিতা যেন তোমাদের কখনও এ ব্যাপারে উদ্যোগী না করে যে, তোমরা সুবিচার করবে না; বরং সুবিচার কর, এটাই আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, কেননা, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।' (মায়িদা : ৮)

অপর একটি বিষয় হলো ইসলাম সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য যে কোন চুক্তি এবং তা যার সাথেই করা হোক না কেন, একে অবশ্য পালনীয় ও মহামূল্যবান বলে গণ্য করে। একারণেই সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতেই মুমিনদের প্রতি তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : 'হে বিশ্বাসিগণ! চুক্তিসমূহ রক্ষা কর।' এ নীতির ভিত্তিতেই রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধিসহ যত চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করেছেন, শেষ পর্যন্ত তার ওপর বলবৎ থেকেছেন। প্রতিপক্ষ যতক্ষণ না তা ভঙ্গ করেছে তিনি চুক্তিনামার প্রতিটি ধারা মেনে চলেছেন। এর ব্যতিক্রম কখনও ঘটে নি। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি লঙ্ঘন করলেই কেবল ইসলাম আমাদের তা বাতিল করার অনুমতি দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলছেন : 'এবং যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নিশ্চিত বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর, তবে তুমিও সমানভাবে (তাদের চুক্তিকে) তাদের দিকে ছুঁড়ে দাও; নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।' (আনফাল : ৫৮)

তাই ইসলাম কেবল যারা কোনরূপ প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকারনামা ও চুক্তি মানে না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামূলক তৎপরতা চালায় তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে। কোরআন এ নীতির বিষয়টিকে উল্লেখ করে বলছে : 'কিভাবে আল্লাহর নিকট এবং তাঁর রাসূলের নিকট (চুক্তি ভঙ্গকারী) অংশীবাদীদের কোন চুক্তি রক্ষিত থাকবে?...যেক্ষেত্রে তারা যদি তোমাদের ওপর প্রভাবশালী হয়, তবে তোমাদের সঙ্গে না আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে, আর না চুক্তি ও অঙ্গীকারের; তারা তাদের মুখের কথায় (মুখরোচক বাক্যে) তোমাদের সন্তুষ্ট করে; কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে; এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবাধ্য। ...তারা কোন বিশ্বাসীর (মুসলমান) সঙ্গে না আত্মীয়তার গ্রাহ্য করে, না অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে; প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সীমালঙ্ঘনকারী।...এবং তারা যদি অঙ্গীকার করার পর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের ব্যাপার নিয়ে

বিদ্রূপ করে, তবে অবিশ্বাসীদের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কেননা, তাদের প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই, যাতে তারা নিরস্ত হয়।' (তওবা : ৮, ১০ ও ১২)

এ আয়াতগুলোতে আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়– যাদেরকে শেষোক্ত আয়াতে 'অবিশ্বাসীদের নেতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাদেরকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। কারণ, তারা কোন মানবিক নীতি মেনে চলে না, সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তির প্রতি ভ্রুকুটি দেখায় এবং অন্য সব জাতির অধিকারকে পদদলিত ও উপেক্ষা করে। এ অপশক্তিরা অন্যদের সম্পদ লুট ও কুক্ষিগত করে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে মজবুত ও সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালায়। আর তারা তাদের স্বার্থের কারণে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দাবানল জ্বালিয়ে রাখে ও তাদের অস্ত্র ব্যবসায়কে চাঙ্গা রাখতে লক্ষ মানুষের জীবনকে হুমকিতে ফেলে। অত্যাচার-অনাচার, বৈষম্য ও বিশৃখলা সৃষ্টি করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।তাদের এ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন : 'তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন; এবং তারা পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী, অথচ আল্লাহ অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।' (মায়িদা : ৬৪) 'এবং যখন তারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তারা দেশে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং ক্ষেত-খামার ধ্বংস ও মানব প্রজন্মকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়ায়। আর আল্লাহ অশান্তিকে ভালোবাসেন না।' (বাকারা : ২০৫)

মহান আল্লাহ কখনই অরাজকতা ও অশান্তিকে ভালোবাসেন না। তিনি চান তাঁর বান্দারা পৃথিবীতে শান্তিতে বসববাস করুক। তিনি কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন যারা এ শান্তিকে বিনষ্ট ও বিঘ্নিত করতে চায়। যারা এ নীতির ব্যতিক্রম করে নিরীহ, নিরপরাধ সাধারণ মানুষের জীবন হানির চেষ্টা চালায় তারা কখনই ইসলামের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পারে নি। বরং তারা তাদের এরূপ কর্মের মাধ্যমে ইসলামের বিরূপ ও বিকৃত এক চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করে। ইসলামের সাথে এ গোষ্ঠীর কর্মের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। আল্লাহ আমাদের ইসলামের মহান নীতিমালা ও আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়া ও তার অনুসরণের তওফিক দিন।

নীতি-নৈতিকতা

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

মোহাম্মদ আলী সোমালী

সকল ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের একটি সাধারণ বিষয় হলো এটা যে, মানুষের কিছু আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। যদিও আমরা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি উপভোগ করি, কিন্তু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে একটি দায়িত্বশীল উপায়ে অনুশীলন করা প্রয়োজন। যেমনভাবে আমরা চাই যে, অন্যরা আমাদের মর্যাদা ও স্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, তেমনি আমাদেরও উচিত অন্যদের মর্যাদা ও স্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আমাদের আরো উচিত আমাদের নিজেদের মর্যাদা এবং দীর্ঘমেয়াদি লাভের প্রতিরক্ষা করা। সুতরাং আমরা আমাদের কামনা-বাসনার পেছনে ছুটতে পারি না এবং যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারি না। আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মশৃঙ্খলা থাকা উচিত যা আমাদেরকে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করবে। যদি আমরা আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারি তাহলে আমাদেরকে আর আমাদের প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে হবে না এবং নিচু কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হবে না। যেহেতু একজন পরিশুদ্ধ ব্যক্তি তার এবং অন্য সকলের জন্য ভালো ও নৈতিক ছাড়া আর কিছু কামনা করে না। আমরা নিম্নে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করব।

আত্মনিয়ন্ত্রণ

আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মহিমান্বিত কুরআন বলছে :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের মর্যাদাকে ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তির কামনা হতে নিজেকে বিরত রেখেছিল, তবে একমাত্র জান্নাতই তার আশ্রয়স্থল। ৭৯: ৪০-৪১

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦

হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খালীফা (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেছি, সুতরাং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না; কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে, হিসাব দিবসকে বিস্মৃত হওয়ার কারণে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। ৩৮;২৬

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

(১৩৫) হে বিশ্বাসিগণ! ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও যদিও তা স্বয়ং তোমাদের বা তোমাদের পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; (যার জন্য বা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে) সে সম্পদশালী হোক বা নিঃস্ব (তা যেন তোমাদের সাক্ষ্যে প্রভাব না ফেলে)। কেননা, (পৃষ্ঠপোষক হিসেবে) আল্লাহ উভয়ের জন্য তোমার অপেক্ষা অধিক অধিকারপ্রাপ্ত, সুতরাং (সাবধান!) স্বীয় প্রবৃত্তি (ও স্বার্থপরতার) অনুসরণ কর না যাতে ন্যায়বিচার করতে পার, আর যদি (সত্যকে) বিকৃত কর অথবা উপেক্ষা কর (তবে স্মরণ রাখ), নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

এখানে আমরা দুই ধরনের উপদেশ দেখতে পাই। প্রথমত, আল্লাহর ইচ্ছাকে দেখা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁকে মেনে চলার চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, আমাদের আত্মাকে যা

আমাদের জন্য ভুল ও ক্ষতিকর তা থেকে বিরত রাখা। এটি সম্ভব তখনই যখন আমাদের নিজেদের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে। নাহজুল বালাগায় একজন অজ্ঞাত ভাইয়ের সুন্দর এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক বর্ণনা রয়েছে যেখানে ইমাম আলী (আ.) বলেছেন– অতীতে আমার একজন মুমিন ভাই ছিল, আমার দৃষ্টিতে সে ছিল মর্যাদাবান। কারণ, দুনিয়া তার দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন ছিল... যদি তার সামনে কোন বিপরীতমুখী বিষয় আসত তাহলে সে দেখত যে, কোনটি তার কামনা-বাসনার অধিকতর নিকটবর্তী এবং সে অন্যটি করত।

আমর দেখছি, একজন মুমিন ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য হলো যখন দুটি বিষয়ের একটি নির্বাচনের মুখোমুখি হয়, (উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি স্থানে অথবা অন্য স্থানে যাওয়ার বিষয়, একটি সভায় অথবা অন্য সভায়, অথবা একটি ব্যবসায় অথবা অন্য ব্যবসায় লিপ্ত হওয়ার), অর্থাৎ যখন সে বিপরীতমুখী কোন পথে পৌঁছায় এবং একটি পথ বেছে নিতে চায় তখন সে তার অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেয়, বোঝার চেষ্টা করে যে, কোন কাজটি তার নিজের কাছে অধিকতর প্রিয়, তার নিজের জন্য লাভজনক এবং তখন সে অপর কাজটি সম্পাদন করে। উদাহরস্বরূপ, কারো হয়তো টিভি দেখা অথবা অন্যকে কোন কাজে সাহায্য করার মতো বিষয় আসতে পারে। যে অন্তর প্রশিক্ষিত নয় সেটি হয়তো আমাদেরকে টিভি দেখায় প্ররোচিত করবে এটি বলে যে, অন্যকে সাহায্য করা সময়ের অপচয়। অথচ এর বিপরীতে অন্যকে সাহায্য করার জন্য সময় বের করা অধিকতর উত্তম।

নিঃসন্দেহে আমরা কেবল এই নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যে সবসময় সঠিক কাজটি বেছে নিতে সক্ষম নাও হতে পারি, কিন্তু এটি খুঁজে বের করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের স্বার্থপর কামনা-বাসনা আমাদেরকে কোন্ কাজটি সম্পাদন করতে বলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমাদের আত্মঅহমিকা বা লোভ আমাদের থেকে কী চায় এবং ঐসব জিনিস যা আমাদের জন্য সত্যিকারভাবে লাভজনক তার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যখন আমরা আমাদের সত্যিকার লাভের জন্য কোন কাজ করি তখন আমরা অন্য মানুষের লাভের ব্যাপারটিকেও নিরাপদ করি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, যখন আমরা নিজেদের সেবায় লিপ্ত হই, তখন আমরা সমগ্র মানবজাতির সেবা করি। কিন্তু যদি আমরা চতুর হওয়ার চেষ্টা করি এবং কেবল নিজেদের সেবা করতে চাই, তখন আমরা কেবল

আমাদের ক্ষতি করি না; বরং অন্যদেরও ক্ষতি করি। নিজেদের ও অন্যদের ক্ষতি করার অনেক পথ রয়েছে। কিন্তু একজনকে সত্যিকার সেবা দেয়া, অন্য কাউকে সেবা না দেয়াটা সম্ভব নয়।

আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে যা আমরা ব্যবহার করতে পারি যখন আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাই এবং দুটি বা তিনটি অপশন বিবেচনা করতে হয় এবং আমরা জানি না, কী করতে হবে। এই রকম ক্ষেত্রে এটি কল্পনা করা কার্যকরী/উপকারী যে, যে ব্যক্তি খুবই ধার্মিক এবং যাঁর কর্মকাণ্ডকে আপনি বিশ্বাস করেন এবং গ্রহণ করেন, তিনি আপনার স্থলে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করুন যে, তিনি আপনার স্থলে থাকলে কী করতেন। যেহেতু আপনার কাছে তথ্য রয়েছে যে, সাধারণভাবে তিনি যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং অভিপ্রায় এবং ভালো ইচ্ছা সম্পর্কে আপনি জানেন, এই বিষয়টি মাথায় রেকে আপনি হয়তো কী করতে হবে তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি একজন ধার্মিক পণ্ডিত ব্যক্তি অথবা ধার্মিক আত্মীয়কে কল্পনা করতে পারেন, জরুরি নয় যে, আপনি কোন মাসুম অথবা নবীকে কল্পনা করবেন। আপনি এরপর চিন্তা করতে পারেন, তাঁরা কী করতেন এবং এটি আপনার কোন্ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিতে পারে।

তাই এটি একটি মৌল বাস্তবতা যে, আমাদেরকে অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা কেবল সেটাই করব আমাদের নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করে যা আমরা চাই, তাহলে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা সম্পর্কে বলার কিছু নেই। নিঃসন্দেহে ইসলাম বলে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ হলো কেবল শুরু, এটি সেসব লোকের জন্য যারা যাত্রার শুরুতে রয়েছে। আমাদেরকে যা করতে হবে তা হলো আমাদের আত্মাকে রূপান্তর করতে হবে– যে আত্মার নিচুর কামনার দিকে আকর্ষণ আছে, তাকে এমন আত্মায় পরিণত করতে হবে যার ভালোর প্রতি আসক্তি রয়েছে। তাহলে আমাদের আত্মা নিজেই সাহায্যকারী হয়ে উঠবে এবং আমাদেরকে সহায়তা করবে। কিন্তু এটি অনুশীলনের বিষয় এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার বিষয়। মাওলানা রূমীর 'মসনভী'তে একটি সুন্দর গল্প রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, একটি আত্মা কীভাবে ভালো অথবা মন্দে রূপান্তরিত হতে পারে। রূমী বলেন, একদা একটি স্থানে আতরের বাজার ছিল যেখানে আতর বিক্রেতাদের প্রত্যেকের একটি করে আতরের দোকান

ছিল। তাই বাজারে যারাই প্রবেশ করত তারা আতরের সুঘ্রাণ পেত। প্রত্যেকেই এটি উপভোগ করত, বিশেষ করে আতর বিক্রেতারা, যারা ভিন্ন ভিন্ন ঘ্রাণ সম্পর্কে অভিমত প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দক্ষ, যেখানে আমরা কয়েকটি ভিন্ন ধরনের আতরের ঘ্রাণ নিলেই দ্বিধায় পড়ে যাই।

একদিন এক লোক তার ঘোড়া নিয়ে বাজারে প্রবেশ করল আর ঘোড়াটিও মলমূত্র ত্যাগ করে বাজারের রাস্তা নোংরা করে ফেলল। লোকজন খুবই রাগান্বিত হলো, তারা এই দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছিল না, কিন্তু কারো সাধ্য নেই যে, সেই নোংরা পরিষ্কার করবে। এটি তাদের কাছ খুব কষ্টের একটি বিষয় ছিল। তাই কেউ একজন পরামর্শ দিল যে, একজন লোককে আনা প্রয়োজন যে ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করার কাজ করে। তারা এক যুবককে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য বলল। যুবকটি এ কাজে রাজি হলো, কারণ, তার পেশাই ছিল এ কাজ করা। কিন্তু যখন যুবকটি সেই বাজরে প্রবেশ করল, তখন সেই নোংরা জায়গায় পৌঁছানোর পূর্বেই যখন সে সুগন্ধির ঘ্রাণ পেল তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। কারণ, সে দুর্গন্ধে অভ্যস্ত ছিল, তাই সে সুগন্ধ সহ্য করতে পারে নি।

এই রকমভাবে, একদিকে আমরা দেখতে পাই সেসব মানুষ যারা নামাযকে উপভোগ করে, যারা আল্লাহর সাথে নিভৃতে সময় ব্যয় করাকে উপভোগ করে। অন্যদিকে আমরা এমন মানুষকেও দেখতে পাই যারা আপনাকে নামায পড়তে দেখলে রাগান্বিত হয় এবং এটি তাদের ব্যথিত করে। যখন তারা আপনাকে মসজিদে অথবা চার্চে যেতে দেখে তখন তারা বিরক্ত হয়। একটি হাদিসে রয়েছে–

একটি মসজিদের ভেতরে একজন মুমিন পানির মধ্যে মাছের মতো, কিন্তু যখন একজন কপট ব্যক্তি মসজিদে থাকে, তখন সে জেলখানার মতো অনুভব করে এবং সর্বক্ষণ সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে।

তাই এগুলো হলো আত্মার বিভিন্ন অবস্থা যা আমরা আত্মপ্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে লাভ করতে পারি।

আত্মশুদ্ধি

মহিমান্বিত কোরআনে আল্লাহ তাআলা পরিশুদ্ধি ও মানুষের পবিত্রতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ۝١ وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ۝٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ۝٣ وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا ۝٤ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ۝٥ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ۝٦ وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ۝٨ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠

(১) শপথ সূর্যের এবং তার পূর্বাহ্নের (কিরণের), (২) শপথ চন্দ্রের যখন তার পশ্চাতে আবির্ভূত হয়, (৩) শপথ দিবসের যখন তা সেটাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে, (৪) শপথ রজনীর যখন তা সেটাকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ অন্তরীক্ষের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, (৬) শপথ ধরণীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, (৭) শপথ আত্মার এবং যিনি তা সুগঠিত (ও উপযুক্ত রূপ দান) করেছেন, (৮) এবং এর প্রতি এর মন্দকর্ম ও এর আত্মসংযমকে প্রক্ষিপ্ত করেছেন, (৯) নিঃসন্দেহে যে এটাকে (আত্মাকে) পরিশুদ্ধ (ও বিকশিত) করেছে, সে-ই সফলকাম হয়েছে। (১০) এবং নিঃসন্দেহে যে এটাকে (গুনাহ দ্বারা) আচ্ছাদিত করেছে, সে-ই নিরাশ হয়েছে।৯১ : ১-১০

সুতরাং ১১টি কসমের পর, অনেক গুরুত্ব আরো করার পর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পবিত্র করেছে সে সফলকাম হবে এবং যারা তাদের আত্মাকে দূষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত করবে তারা ব্যর্থ হবে। কিয়ামত দিবসে মানুষের দুটি দল থাকবে : যারা সফল এবং সুখী– কারণ, তারা তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিল এবং যারা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থানে থাকবে, কারণ, তারা ছিল নির্লিপ্ত এবং তাদের আত্মার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারী।

আত্মার পরিশুদ্ধি আল্লাহর নৈকট্য লাভের পূর্বশর্ত। নিশ্চয়ই নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পুরো বিষয়টিই হলো আত্মার পরিশুদ্ধি। কেবল তখনই আত্মা জ্বলজ্বল করতে শুরু করে, আল্লাহর কাছ থেকে পরম রশ্মি ও আলো গ্রহণ করে ও প্রতিফলন শুরু করে। যদি আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, যিনি পরম

পবিত্র, তাহলে আমাদেরকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। অপবিত্র হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়া অসম্ভব বিষয়। যখন আমরা কোথাও যেতে চাই যেখানে মানুষজন স্মার্ট, উত্তম পোশাকধারী এবং সুন্দর, তখন আমাদের উচিত নিজেদেরকে পরিষ্কার ও পরিপাটি করা, আমাদের উচিত উত্তম কাপড় পরিধান করা, আর কোনভাবে তাদের সমমানের করে নিজেদের প্রস্তুত করা। অন্যথায় তারা বলবে যে, আমরা তাদের সমাবেশকে নষ্ট করে ফেলেছি এবং তাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছি। প্রত্যেক নবী (আ.)-এর অন্যতম প্রধান কাজ এবং ঐশী বাণী শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মতৎপরতার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল মানুষকে তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার কাজে সাহায্য করা। মহানবী (সা.)-এর মিশন সম্পর্কে মহিমান্বিত কোরআন বলছে :

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং গ্রন্থ (শরীয়তের বিধান) ও প্রজ্ঞা শিক্ষাদান করে; যদিও ইতঃপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ৬২ : ২,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

অবশ্যই আল্লাহ বিশ্বাসীদের অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের জন্য তাদের (জাতির) থেকেই এক রাসূল প্রেরণ করেছেন যে তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে শুনিয়ে থাকে, তাদের (আত্মাগুলো) বিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়; এবং নিশ্চয় তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। ৩ : ১৬৪,

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولاً مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ﴿١٥١﴾

(১৫১) (হে মুসলমানগণ!) যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য হতে এক রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, তোমাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তোমাদের গ্রন্থ (কুরআন) ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়; এবং তোমরা যা কখনও জানতে না তোমাদের তা শিক্ষা দেয়। ২ : ১৫১

তাই আমরা দেখি যে, মহানবী (সা.)-এর মানুষের সামনে কুরআন পাঠ এবং তাদেরকে কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে অন্যতম যে কাজটি ছিল তা হলো আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার কাজে আমাদেরকে সাহায্য করা। নিশ্চয়ই মহানবী (সা.)- কে এই কাজে নিয়োগ করা ছিল হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর দোয়ার উত্তরে যা তাঁরা কাবা ঘরে ভিত্তি উচ্চ করার পর আল্লাহর কাছে করেছিলেন :

وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولاً مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

(১২৭) (সে সময়কেও স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি উত্তোলন করছিল (এবং অন্তরে প্রার্থনা ছিল) 'হে প্রতিপালক! আমাদের (পরিশ্রম) কবুল কর, নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।' (১২৮) 'হে প্রতিপালক! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত এক উম্মত সৃষ্টি কর। আমাদের উপাসনার পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, অনন্ত করুণাময়।' (১২৯) 'হে

প্রতিপালক! এবং তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য এক রাসূল আবির্ভূত (ও উত্থিত) কর যে তাদের সম্মুখে তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবে, তাদের ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা (বিবেকের কথা) শিক্ষা দেবে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবে। অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (২ : ১২৭-১২৯)

চিন্তা করুন, ইবরাহীম (আ.) কেমন জ্ঞানী ছিলেন! তাঁর প্রার্থনা কত সুন্দর ছিল! পবিত্র কুরআনের তিনটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি মহানবী (সা.)- কে পাঠিয়েছেন সেই বিষয়ে যা ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) চেয়েছিলেন: ঐশী কিতাবের আয়াত মানুষের সামনে পাঠ করা, ঐশী কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া এবং তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা।

অবশ্য আল্লাহই তাঁদেরকে এভাবে প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ এত ক্ষমাশীল যে, তিনি প্রথমে আমাদেরকে তাঁকে ডাকার আহ্বান করেছেন, তারপর কী চাইতে হবে সেটার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এরপর তিনি আমাদেরকে আমাদের ডাক ও প্রার্থনার জবাব দেন।

সুতরাং মানুষের পরিশুদ্ধি মহানবী (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল এবং অন্য সকল নবীরও। এই আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে আত্মার পরিশুদ্ধকরণের কাজের ব্যাপক গুরুত্বকে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর প্রার্থনায় কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষাদানের বিষয়টি পরিশুদ্ধকরণের পূর্বে এসেছে, কিন্তু মহান আল্লাহ যে তিনটি জায়গায় মহানবী (সা.)-এর মিশন সম্পর্কে বলেছেন সেখানে পরিশুদ্ধকরণের বিষয়টি কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষাদানের বিষয়ের পূর্বে এসেছে। এটি পরিশুদ্ধকরণের অগ্রাধিকার এবং ব্যাপক গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটি এটাও নির্দেশ করে যে, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা করার পূর্বশর্ত হলো পবিত্র হওয়া।

অপবিত্রতার অনেক উৎস রয়েছে। অপবিত্রতার একটি প্রধান বা প্রধানতম উৎস হলো বস্তুগত জীবন এবং দুনিয়াবি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা)– যে সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা সকল অপকর্মের উৎস। দেখ, এই দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তাকে ভালোবাসে; এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? – বিহারুল আনওয়ার, ৬৭তম খণ্ড, পৃ. ৩১৫

বস্তুগত জীবন আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং একে কারো জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্যে পরিণত করা হলো মারাত্মক ভুল এবং অপবিত্রতা। সুতরাং এই সমস্যার অন্যতম প্রধান চিকিৎসা এবং আত্মার পরিশুদ্ধির একটি গুরুতর মাধ্যম হলো মানুষকে দান-সদাকাহ করতে বলা। কুরআনে প্রায় ২০টি আয়াতে নামায কায়েম করতে বলার পরই যাকাত দানের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর উপাসনা করতে এ অবস্থায় যে, তাঁর জন্যই ধর্মকে খাঁটি করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দান করে, এটাই সুদৃঢ় দীন। ৯৮ :৫

'যাকাত' শব্দটি 'তাযকিয়া' (পরিশুদ্ধি) শব্দটির একই ধাতুমূল থেকে উৎসারিত, আর তা হলো 'যা-কা-ওয়া'– যার অর্থ বৃদ্ধি এবং পবিত্রতা। এটি বলা হয়েছে যে, দান-সদাকাকে যাকাত বলার কারণ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে যে, যাকাত দান কারো অর্থ ও সম্পদকে পবিত্র করে। এটিও সত্য যে, দান-সদাকা কারো অর্থ এবং সম্পদ বৃদ্ধি ও বরকতের কারণ। এটি অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, দানকে 'যাকাত' বলার প্রধান কারণ হলো এই যে, এটি আত্মাকে পবিত্র হতে সাহায্য করে এই দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এই কারণে মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-কে বলেন :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠٣

(১০৩) (হে রাসূল!) তুমি তাদের সম্পদের যাকাত গ্রহণ কর এবং এর মাধ্যমে তাদের পবিত্র কর এবং তাদের জন্য দোয়া কর; কেননা, তোমার দোয়া তাদের পক্ষে চিত্তের প্রশান্তিস্বরূপ; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। ৯ :১০৩

এই আয়াতে 'যাকাত' পরিভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে 'সাদাকাহ' (দান) ব্যবহৃত হয়েছে। যাহোক, একই বিষয় এখানে আল্লাহর খাতিরে অর্থ দান করা দাতার পরিশুদ্ধি অর্জনে সাহায্য করে। (২)

অন্যত্র কুরআন বলে :

ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ﴿١٩﴾ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

(১৮) যে তার সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য (১৯) এবং তার নিকট কারও কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান (স্বরূপ ঐ সম্পদ প্রার্থীকে) দেওয়া হয়, (২০) কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনায়; (২১) অতিসত্বর সে সন্তোষ লাভ করবে। ৯২ : ১৮-২১

সুতরাং যখন কেউ আল্লাহর জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করে এই বিষয়ে, যেমন অভাবী মানুষকে দান করা, অথবা সর্বসাধারণের কল্যাণে কোন বিল্ডিং তৈরি করা, যেমন মসজিদ, সেমিনারিস, বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল, তখন দাতা ও গ্রহীতা সবাই উপকার লাভ করে। কিন্তু মূল উপকৃত ব্যক্তি হলো দাতা যে কিছু অর্থ দান করেছে যা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ বা নগণ্য এবং বিপরীতে সে পবিত্রতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

(১৮) এবং কোন ভারবাহীই অন্য কারও (গুনাহের) ভার বহন করবে না, আর যদি কোন ভারাক্রান্ত তার ভার বহনের জন্য কাউকে আহ্বানও করে তবে তা হতে কিছুই বহন করতে পারবে না, হোক সে নিকটাত্মীয়। তুমি কেবল তাদেরই সতর্ক করতে

পার যারা সংগোপনেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর যে কেউ পবিত্রতা অবলম্বন করবে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করবে; এবং (সকলের) প্রত্যাগমন তো আল্লাহর দিকেই। (৩৫: ১৮)

উপসংহার

এটি একটি মূল বিষয় যে, আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ থাক অবশ্যই দরকার। আত্মশৃঙ্খলা ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিকতা হতে পারে না। আমরা আমাদের উন্নত করতে পারব না কেবল আমরা যা ইচ্ছা করি এবং আমাদের আত্মাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে। নিশ্চয়ই ইসলাম আমাদের বলে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ হলো শুরু। যা আমাদের করা প্রয়োজন তা হলো আমাদের আত্মাকে যার নিচু কামনা-বাসনার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে তাকে উত্তম বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত একটি আত্মায় রূপান্তর করা। আমাদের আত্মাকে প্রশিক্ষণ দান ও পরিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে আমাদের আত্মা নিজেই আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে সহায়তা করবে। সকল নবী-রাসূলের বিশেষ করে মহানবী (সা.)-এর একটি প্রধান কাজ ছিল মানুষকে পরিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা। আত্মশুদ্ধির ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করার কারণ হলো আল্লাহ হলে পরম পবিত্র এবং পরম পূর্ণ এবং একমাত্র আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই আমরা তাঁর নৈকট্য অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে পারব। পরিশুদ্ধির অন্যতম প্রধান পথ হলো মহান আল্লাহর খাতিরে অর্থ দান করার মাধ্যমে এই বস্তুগত দুনিয়ার জীবনের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হওয়া।

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

ধর্ম ও দর্শন

কুরআনের সাক্ষ্য : মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি

মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ নিষ্পাপত্বের দলিলসমূহের পর্যালোচনা

হজের দর্শন ও শিক্ষা

ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

ইসলামের নারীর অধিকার

ইমাম আলী (আ.) এর কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা

কুরআনের সাক্ষ্য
মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা গুরুত্ব অনুসারে মানুষের সামনে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করেছেন। প্রথমত আত্মার কথা এবং পরে শরীরের কথা। তিনি দেহ বা শরীরকে প্রকৃতি, বস্তু, পাঁকানো কাদা ও মাটি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সম্পর্কে কালামে পাকে বলা হয়েছে :

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

'স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কাদা থেকে।' (সূরা সাদ : ৭১)

আল্লাহ তাআলা নিজে এই মানবদেহে রুহ সঞ্চার করেন। কালামে পাকে বলা হয়েছে:

لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

'যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজাদবনত হয়ো।' (সূরা হিজর : ১৫)

মানুষের অস্তিত্বের সূচনা হয় ভ্রূণ থেকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾

'সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন।' (সূরা কিয়ামাহ : ৩৭-৩৮)

মানুষ হিসাবে আমাদের মাঝে যে রুহ আছে, সে কারণেই আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি সিজদাবনত। ভ্রূণ পুরুষ বা নারী যাই হোক একটিতে রূপ নেয়ার পর তাতে রুহ বা আত্মার সঞ্চার হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

'অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী।' (সূরা কিয়ামাহ : ৭৫)

পবিত্র কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, যখন কোন ভ্রূণ নারী বা পুরুষে রূপ নেয়, তারপর তাতে আত্মা বা রুহ আসে। আবার এমন ধারণাও করা যেতে পারে যে, দেহের আগেই রুহ আগমন করে অথবা দেহ গঠিত হওয়ার সাথে সাথেই রুহ আগমন করে। আত্মা মূলত একটি নির্বস্তুক সত্তা। এ সম্পর্কে তৃতীয় একটি ধারণাও বিদ্যমান। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন কোনটি পুরুষ আর কোনটি নারী এবং তার নিজের কাজ কি এবং কার কি মূল্যায়ন হবে? এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ۝١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝٢ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ۝٣

'শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে, শপথ দিবসের যখন তা আবির্ভূত হয় এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা লায়ল : ১-৩)

এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন দিন ও রাতের নামে শপথ করেন তখন তিনি নারী ও পুরুষের নামেও শপথ করেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার দোহাই দিয়ে কথা বলেন সৃষ্টবস্তু বা প্রাণীর নামে নয়। আর নারী ও পুরুষ যদি মর্যাদা পাওয়ার মতো যথেষ্ট নৈতিক উৎকর্ষযুক্ত গুণসম্পন্ন না হয়, তাহলে তিনি কোন সৃষ্টির নামে শপথ করতে পারেন না।

পবিত্র কুরআনের 'জাওজ' ও 'জাওজাহ'

পবিত্র কুরআনে 'জাওজ' (জোড়া) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আবার 'জাওজাহ' (স্ত্রী) ও 'জাওজাত' (স্ত্রীগণ) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয়েছে আজওয়াজ শব্দের পরিবর্তে। বলা হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ۝١

'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।' (সূরা নিসা : ১)

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেহেশতে মুসলমানরা পবিত্র সঙ্গী বা 'জাওজ' লাভ করবে। উল্লিখিত এই জাওজ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় নারী ও পুরুষ উভয়ে একে অপরের সঙ্গী বা জোড়ার অধিকারী হবে।

মানুষের জন্য মানসম্মত জ্ঞান

মানসম্মত জ্ঞান মানুষের মানবীয় প্রকৃতিকে হেফাজত করে, ব্যক্তি পুরুষ না স্ত্রী তাতে কিছু যায় আসে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَـٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

'স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন : 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে : 'নিশ্চয়ই।' (সূরা আরাফ : ১৭২)

খোদার প্রতি আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গের এই অঙ্গীকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানষের ওপর সমানভাবে বর্তায়। এই অঙ্গীকার আসে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান থেকে, অর্জিত জ্ঞান থেকে নয়। মানব প্রকৃতিতে এই উচ্চতর সাফল্য অর্জিত হওয়া আবশ্যকীয়। পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দিনে প্রতিষ্ঠিত কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পবিবর্তন নেই।' (সূরা রূম : ৩০)

এই আয়াতে কেবল নারী বা কেবল পুরুষ নয়, সমগ্র মানব সমাজকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কেননা, মানব সমাজ একটি একক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিতে সৃষ্ট। এটি কেবল অতীত বা কেবল বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়। এই বৈশিষ্ট্য-প্রকৃতি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পবিত্র কুরআনের অপর দুটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۝٨

'শপথ মানুষের এবং তাঁরও যিনি মানুষকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।' (সূরা শামস : ৭-৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ ভুল ও সঠিক উভয় দ্বারই অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং জন্মের ব্যাপারে তার কোন অর্জিত জ্ঞান নেই। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٧٨

'এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না।' (সূরা নাহল : ৭৮)

যখন মানুষ জন্মলাভ করে তখন বাহ্যিক পৃথিবী সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান থাকে না, পরে অর্জন করে। তবে প্রতিটি মানুষের একটি স্বভাবসুলভ বা অনুভূতিমূলক জ্ঞান আছে এবং তা আত্মার পরিশুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। অনুভূতিসূচক বা স্বভাবসুলভ জ্ঞান মানুষের সাথেই জন্মলাভ করে, মানবীয় কোন চিন্তাধারায় তা অর্জন করা যায় না।

এটি মানুষের মূল পুঁজি হিসাবে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত রহমতের উপহারস্বরূপ। আর অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যয়ন-গবেষণার মাধ্যমে লাভ করতে আদেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ

'প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে।' (সূরা হাশর : ১৮)

এখানে কুরআন বলছে যে, প্রতিটি আত্মাকে এই মর্মে সচেতন হতে হবে যে, আগামীকালের জন্য সে কি করছে। তাই আত্মার জন্য চাই পরিশুদ্ধি, নারী বা পুরুষ সে প্রশ্নের কোন অবকাশ এখানে নেই।

মানুষ খোদ অর্জিত আমানত রক্ষাকারী

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় যা না করতে পারে মানুষ তা করতে পারে। যেমন

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

'আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল, কিন্তু তা বহন করল।' (সূরা আহযাব : ৭২)

এখানে সে কুরআনের আমানত এবং ঈমান, জ্ঞান ও ধর্মের অঙ্গীকার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই আমানত ন্যস্ত করতে গিয়ে মানুষের ওপর কোন বল প্রয়োগ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥﴾

'যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ।' (সূরা জুমআ : ৫)

নিবেদিতচিত্তে খোদানুগত্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একত্ববাদী প্রকৃতির কোন আত্মা যখন অনুপ্রাণিত ও বিবেকচালিত হয়ে খোদায়ী আমানত রক্ষা করতে সক্ষম বলে নিজেকে প্রমাণ করে তখন সে না আকাশের সাথে আর না যমীনের সাথে তুলনীয়, তখন সে আত্মা নিখিল সৃষ্টির উর্ধ্বে উঠে যায়। অতএব, সে নারী না পুরুষ সে প্রশ্ন তখন অবান্তর। এটি হচ্ছে তার মানবীয়তা এবং এটিই প্রণিধানযোগ্য। কুরআনে বলা

হয়েছে, মানুষ আল্লাহর আমানত রক্ষা করতে সক্ষম। একথায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষ অন্যদের জন্য প্রবেশ অযোগ্য আসমানেরও ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

আল্লাহ তাআলা মানুষের উদ্দেশ্যে

এবার আলোচনা করে দেখা যাক, মানুষ কি এত উচ্চ মর্যাদার স্থানে উঠতে পারে, যেখানে ফেরেশতারা পর্যন্ত উঠতে পারে না। হ্যাঁ, অবশ্যই পারে, যদি সে তার আধ্যাত্মিক মওজুদের যোগ্যতা ব্যবহার করে এবং খোদায়ী আমানত ঈমানদারীর সাথে সংরক্ষণ করে। কালামে পারেক বলা হয়েছে :

۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

'মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত ব্যতিরেকে, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন।' (সূরা শুরা : ৫১)

এই আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তিনটি মাধ্যমে মানুষের সাথে কথা বলেন। যেমন-

ক। প্রত্যক্ষভাবে ওহীর মাধ্যমে, যেখঅনে সৎমানুষ ও আল্লাহ তাআলা ছাড়া মধ্যখানে আর কোন মানুষ, আসমান ও ফেরেশতারা থাকে না।

খ। হযরত মূসা (আ.)- কে আল্লাহ তাআলা গাছ থেকে সৌভাগ্যের ময়দানে একটি উত্যকার ডান দিকে ডেকে নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন :

أَن يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾

'হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগৎসমূহের প্রতিপালক।' (সূরা কাসাস : ৩০)

গ। তিনি এক একটি বাণী পাঠান তাঁর আয়াতের মাধ্যমৈ তিনি যা প্রকাশ করতে চান তা প্রকাশ করার জন্য।

মহানবী (সা.)-এর মেরাজ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তাঁর খোদার মুখের কথা দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছলেন। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে :

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ ... لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا

'রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং মুমিনগণ এবং আল্লাহ কারো ওপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত।' (সূরা বাকারা : ২৮৫-২৮৬)

এগুলো হচ্ছে পবিত্র কুরআনী জ্ঞানের কয়েকটি মুক্তাদানা যা ফেরেশতাদের কোন অংশ ব্যতিরেকেই উপলব্ধ হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মেরাজের সময় ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) বলেছিলেন : 'এখন একজন বিশুদ্ধ মানুষ এত উপরে আরোহণ করেছেন যে, কোন ফেরেশতার পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়।'

এ প্রসঙ্গে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর একটি উক্তি নিম্নরূপ। দোয়ায়ে কুমায়েলে তিনি বলেছিলেন : 'ফেরেশতারা আমাদের অতি গোপনীয় কিছু বিষয় জানতে পারে না, যদিও আল্লাহ তাআলা আমরা কি করি তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যই তাদেরকে প্রেরণ করেছেন, তবে ঐ গোপন বিষয়গুলো এতই জটিল যে, ফেরেশতারা যে আলোর পর্দা ভেদ করতে এবং বুঝতে পারে না।' অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَٱللَّهُ يَكۡتُبُ مَا يُبَيِّتُونَۖ

'তারা যা রাতে পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।' (সূরা নিসা : ৮১)

এর কারণ, আল্লাহ তাআলা চান তাঁর এবং তাঁর বান্দার মধ্যকার গোপন বিষয় লুক্কায়িত থাক এবং তা যেন তাদের খ্যাতি নষ্ট না করে।'

আল্লাহ তাআলা চক্রান্তকারী ও বিপথগামীদের হিসাব নেয়ার জন্য নিজে তাদেরকে তলব করেন। অতএব, প্রতি ফেরেশতারই তাদের জ্ঞান অবস্থান আছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٞ مَّعۡلُومٞ ١٦٤

'আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে।' (সূরা সাফফাত : ১৬৪)

ফেরেশতারা যদি আমাদের মতামত, স্মৃতিচিহ্ন, কথাবার্তা ও কর্ম লিপিবদ্ধ করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁদের এক বিরাট দৃষ্টিক্ষেত্র এবং বস্তু প্রকৃতি সম্পর্কে এক ব্যাপক সচেতনতা রয়েছে। একথা সত্য, কিন্তু যতদূর সম্ভব বিষয়টি সমগ্র পার্থিব জগতের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষকে মানদণ্ড হিসাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে। এখানে লোকটিকেই যে বিবেচনা করতে হবে

তা নয়; বরং এখানে বিবেচনার মানবীয়তা। আমরা ফেরেশতাদের মর্যাদা ও অবস্থানকে যদি মানবীয় প্রকৃতির পাশাপাশি বিবেচনা করে দেখি, তাহলে আমরা জানতে পারব যে, মানুষ যত উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হতে পারে, তা ফেরেশতাদের আয়ত্তের বাইরে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সতর্ক পর্যবেক্ষণকারী, সদা প্রস্তুত, পদাধিকারী, সদাশয় ও অভিভাবক বলে প্রশংসা করেছেন। তারা নিজেরা কোন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছান না, আবার অন্য কারো চূড়ান্ত পর্যায়ের আওতায়ও যান না।

খোদায়ী ফেরেশতা ও তাঁদের নাম শেখানো

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের নাম শেখানোর অর্থ এ নয় যে, তারা তা জানে না, তাদেরকে তা শেখানো হয়নি বা তারা নিজেরই শিক্ষক। না, এসব কিছু নয়। তবে কিছু সত্য এতই অলৌকিকতাপূর্ণ যে, তা ফেরেশতাদের বোঝার বাইরে এবং তাই সেগুলো তাদের অবশ্যই অবহিত করা দরকার। আরো একটি কথা হলো তারা এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি লাভ করতে পারেন না। অতএব, অবশ্যই তাঁদের মাঝে একটি প্রকাশকারী মাধ্যম থাকতে হবে।

হযরত আদম (আ.)- কে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতের যখন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে সকল নাম (সত্য) শিখিয়ে ফেরেশতাদের সামনে হাজির করে বলেন :

فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسۡمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُواْ سُبۡحَـٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآ

‘এই সবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল : ‘আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো জ্ঞান নেই।’ (সূরা বাকারা : ৩১-৩২)।

এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা একথা বলেননি যে, তিনি ফেরেশতাদের ঐসব বিষয় শেখাবেন যা হযরত আদম (আ.)- কে শিখিয়েছেন। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের জন্য ঐ জ্ঞান অর্জন নিষিদ্ধ করেছেন, তিনি তা মূলত স্থগিত রেখেছেন। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ফেরেশতাদেরকে তিনি ঐ বিষয়গুলো শেখাননি, তবে অবহিতকরণের একটি মাধ্যমে ঐ নামগুলো অবহিত করেছেন। একজন সৎ ও পরিশুদ্ধ মানুষ সেগুলো শেখে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে। এখান থেকে একথা পরিষ্কার হযে যায় যে, কেন স্বর্গীয় আত্মা ফেরেশতাদের অবস্থান নিচে। খোদ আল্লাহ তাআলাই তাঁদের পূর্বে তাঁদের প্রকৃত শিক্ষককে স্থান দিয়েছেন।

মানুষ এবং শয়তানের প্ররোচনা

এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, সকল সত্য জ্ঞানপ্রাপ্ত একজন বিশুদ্ধ মানুষ কেন শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না? এর জবাব হলো এটি একটি সাধারণ অবশ্যম্ভাবিতা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কখনো প্ররোচনার মোকাবিলায় নিজেকে রক্ষা করতে না পেরে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে, তাহলে তার প্রতি এই অবস্থাকে কখনও কখনও অজ্ঞানতাপ্রসূত বা ভুলজনিত বলে বিবেচনা করা হয়। পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় ভুলে যাওয়া সম্পর্কে হযরত আদম (আ.)- কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে :

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

'আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।' (সূরা তাহা : ১১৫)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾

'অতঃপর আমি বললাম : ' হে আদম! এ তোমর ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।' (সূরা তাহা : ১৭)

খোদায়ী রহমত ও মানবীয় মর্যাদা

কোন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিকে না সাধারণভাবে সকল লোককে নামসমূহ শেখানো হয়েছে? এ নামগুলোতে সকল জ্ঞান ও সত্যের শিক্ষা রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পাদিক চুক্তি মান্য করে চলেন, যাদ্বারা তিন প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন এবং স্বভাবতই সৃষ্ট হয়েছেন এবং সকল কিছু গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন, তিনি ঐসব নাম শেখার হকদার।

আবার পবিত্র কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে,

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

'তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, তা পাষণা কিংবা তদপেক্ষা কঠিন।' (সূরা বাকারা : ৭৪)।

এ ধরনের মানুষ পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং সে কারণে তাদের এবং পরিশুদ্ধ মানুষের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তাই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বংশধরদের মতো

পরিশুদ্ধ মানুষদেরকে তাই খোদার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ শেখানো হয়। যিনি জানান এবং যিনি জানেন তাদের ধারণামতই তারা এইসব নামের তাৎপর্য উপলব্ধি করে থাকেন।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) পবিত্র কুরআনের 'উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই; তোমরা তাঁকে সেব নামেই ডাকবে।' এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : 'আমরা ঐ নামসমূহের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত ও অটল আনুগত্যপরায়ণ। যদি ন্যায়বিচার ও তার প্রয়োগ, জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বিষয় এবং পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত বিষয় একক হয় তাহলে আমরাই সেই নামসমূহ। জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বিষয়ের প্রশ্ন যথাযথভাবে নির্ণীত হতে হবে।'

আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের বৈশিষ্ট্য

ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : 'আমরাই আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ এর অর্থ হলো আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ এবং যেহেতু জ্ঞান একটি বাস্তব বিষয়, তাই যিনি জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন তিনি সুন্দরতম নামসমূহের অংশীদার হতে পারেন।'

ফেরেশতাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পদ ও মর্যাদা রয়েছে এবং পার্থিব ফেরেশতারা স্বর্গীয় ফেরেশতাদের তুলনায় আলাদা। আবার স্বর্গীয় ফেরেশতারাও সবাই একই মর্যাদার নন। অনেক সময় মানুষ এত বেশি উচ্চ পর্যায়ে উঠতে সক্ষম হন যে, ফেরেশতারাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। ভালো মানুষদের মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বলেন :

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾

তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ী বাসস্থানের জন্য।' (সূরা যমার : ৭৩) কোন ফেরেশতা মানুষের ওপর শ্রদ্ধাশীল এবং মানুষের দ্বার পরিশুদ্ধ। এসব নির্ভর করে মানুষ কিভাবে আল্লাহ তাআলার অর্পিত আমানত সংরক্ষণ করেছে এবং কিভাবে খোদায়ী আমানত সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।

সংকলন : রায়হানুল ইসলাম

মহানবী (সা.)-এর
নিরঙ্কুশ নিষ্পাপত্বের দলিলসমূহের পর্যালোচনা

'নবুওয়াত' অধ্যায়ের সাথে সংশিষ্ট যে সব বিষয় কালাম শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর অন্যতম বিষয় হচ্ছে নবীদের ইসমাত (নিষ্পাপত্ব)। তাফসীর গ্রন্থসমূহেও আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে এ ব্যাপারে বেশ কিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে। নবীদের নিষ্পাপত্ব এমন সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো নিয়ে বিভিন্ন ইসলামী ফির্কা ও মাযহাবের আলেমদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। তবে ইমামীয়া শিয়া মাযহাবই হচ্ছে একমাত্র মাযহাব যারা নবীদের নিষ্পাপত্ব সংক্রান্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। শেখ মুফিদ (র.) এ ব্যাপারে বলেন : 'ইসলামী ফির্কাসমূহের মাঝে একমাত্র ইমামীয়া শিয়া ব্যতীত আর কোন ফির্কা নেই যারা নবীদের ব্যাপারে নিরঙ্কুশ নিষ্পাপত্বে বিশ্বাসী।'[১] সুতরাং এ ব্যাপারে সঠিক উত্তর দেয়ার লক্ষ্যে প্রথমে আমরা নিরঙ্কুশ নিষ্পাপত্ব প্রমাণ এবং এরপর انا بشر مثلكم 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ'– এ আয়াতটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

আমরা নবিদের নিষ্পাপতা ও নির্ভুলতার বিষয়টি আরও বেশি স্পষ্ট ও বোধগম্য হয় সেজন্য 'ইসমাত' (عِصمَت) শব্দের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা প্রয়োজন।

'ইসমাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ : عصم (আস্‌ম) ধাতুর ক্ষেত্রে মাকায়িসুল লুগাহ্ অভিধানে লেখা হয়েছে : এ শব্দটি (আসম عصم) হচ্ছে এমন একটি আস্‌ল (اصل) অর্থাৎ ধাতুমূল যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে সযত্ন সংরক্ষণ ও সার্বক্ষণিক সংশ্লিষ্টতা। আর 'ইসমাত' (عِصمَت) শব্দটিও এই عصم (আস্‌ম) ধাতুমূল থেকেই উৎসারিত।[২]

'ইসমাত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ : কেউ কেউ (عِصمَت) শব্দটির পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে এ শব্দটিকে 'লুত্‌ফ' (لطف) অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

---

১. মুহাম্মাদ বিন নুমান (শেখ মুফীদ) প্রণীত আওয়ায়েলুল মাকালাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৫।
২. আহমদ ইবনে ফারেস ইবনে যাকারিয়া প্রণীত মাকায়ীসুল লুগাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৩।

শেখ মুফীদ (র.) বলেন : কালাম শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় 'ইসমাত' শব্দটি ঐ ব্যক্তির সাথে একান্ত সংশ্লিষ্ট যে আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে এবং নিজ ইখতিয়ার (স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি) বলে নিজেকে পাপ এবং সব ধরনের মন্দ ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে সংযত ও বিরত রাখে।'[১]

তবে কতিপয় আলেম 'ইসমাত'কে স্থায়ী আত্মিক গুণ বলেও অভিহিত করেছেন। আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমোলী বলেন : 'ইসমাত হচ্ছে এমন একটি শক্তিশালী অপরিবর্তনীয় আত্মিক গুণ যা সর্বদা একজন নিষ্পাপ ব্যক্তির মাঝে প্রকাশ্যে বিরাজমান এবং ক্রোধ ও প্রবৃত্তির মত অন্য যে কোন শক্তি তা বিলুপ্ত করে না।'[২]

১. ইসমাত ও আদালত (ন্যায়পরায়ণতা)-এর মধ্যে পার্থক্য

'ইসমাত' শব্দটিকে স্থায়ীআত্মিক গুণ বলে অভিহিত করার কারণে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হলো : 'ইসমাত' ও 'আদালত' এর মধ্যে পার্থক্যটা কেমন? কারণ, আদালতের সংজ্ঞায়ও স্থায়ী আত্মিক গুণ উল্লেখ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

এ দুই শব্দের মধ্যকার পার্থক্য সংক্ষেপে এভাবে বলা যেতে পারে : অস্তিত্বগত পর্যায়ে আদালত ইসমাত অপেক্ষা দুর্বল। অন্যদিকে ভুল, অসাবধানতা, উদাসীনতা এবং বিস্মৃতি আদালতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এগুলো ইসমাতের সাথে মোটেও খাপ খায় না। উল্লেখ্য যে, আদালত জ্ঞানগত ও তাত্ত্বিক গুণাবলীর অন্তর্গত নয়, বরং কর্মগত আপাত স্থায়ী গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

২. মানব হওয়ার সাথে ইসমাতের কোন বিরোধ নেই

সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানব সৃষ্টি হচ্ছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রজ্ঞাবান স্রষ্টা মানব অস্তিত্বকে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী শক্তি ও উপাদানের সমন্বয়ে এমনভাবে সংমিশ্রিত করে গঠন করেছেন যে, এই গাঠনিক জটিলতাই হচ্ছে তার পূর্ণতা ও জৈব অভিব্যক্তির মূল প্রতীক।

---

১. আওয়ায়েলুল মাকালাত, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ১৬৪।
২. পবিত্র কোরআনের বিষয়ভিত্তিক তাফসীর, পবিত্র কোরআনে ওহী ও নবুওয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭।

মানুষ তার নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের মাঝে ভারসাম্য স্থাপন করে পূর্ণতায় উপনীত হওয়ার পথ সুগম করতে এবং মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগি ও নৈকট্য প্রাপ্তির মাধ্যমে ইসমাতের মাকামে (নিষ্পাপত্বের অবস্থান) উপনীত হতে সক্ষম। যদিও আমাদের মত যারা নাফ্‌সের কামনা-বাসনার বেড়াজালে আবদ্ধ ও রিপুর পর্দাসমূহের অন্তরালে বন্দী, তাদের পক্ষে এ বাস্তবতা উপলব্ধি করা কঠিন। তবে সুউচ্চ এ মাকামে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। আর ইসমাতের মাকাম এবং মানব হওয়ার মাঝেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, প্রত্যেক মানুষ তার নিজ অস্তিত্বগত ধারণ ক্ষমতা অনুসারে আপেক্ষিক (আংশিক বা সীমিত পর্যায়ের) ইসমাতের অধিকারী। কিন্তু উক্ত নিরঙ্কুশ ইসমাত একমাত্র মহান নবীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট যা বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক দলীল-প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত। যদি কিছু সংখ্যক কোরআনভিত্তিক দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) ব্যাপক সর্বজনীন (নিরঙ্কুশ) ইসমাতের অধিকারী তাহলে এই সর্বজনীন ইসমাত কখনই قل انّما انا بشرٌ مثلكم অর্থাৎ 'বলুন : আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ'– এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কারণ, মানুষের নিষ্পাপ হওয়া যে অসম্ভব, এতদসংক্রান্ত কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তাই যে সব আয়াত নবীদের ইসমাতের দলীল সে সব আয়াত এবং উপরিউক্ত আয়াতের মাঝে সর্বজনীনতা ও বিশেষতা (عموم و خصوص)-এর কোন সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে কেউ নবীদের আপেক্ষিক (আংশিক) ও সীমিত পর্যায়ের ইসমাতে বিশ্বাসী হতে পারে না।

যে সব বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক দলীল প্রমাণ পরে বর্ণনা করা হবে সেগুলোর ভিত্তিতে নবী-রাসূলগণ অবশ্যই মাসুম এবং একইভাবে নবী-রাসূলগণকে অবশ্যই মানব হতে হবে। কারণ, নবী-রাসূলগণের প্রেরিত হওয়ার স্থান বা কার্যস্থল হচ্ছে মানব সমাজসমূহ।

وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأۡكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِي فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۚ لَوۡلَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَلَكٞ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا ۝٧

'কেন এই রাসূল (হযরত মুহাম্মাদ সা.) খাবার খান এবং বাজারসমূহের মধ্য দিয়ে হাঁটেন (না তিনি ফেরেশতাদের পন্থা অবলম্বন করেন, আর না তিনি রাজা-বাদশাহ্‌দের রীতি-নীতি মেনে চলেন)? কেন তার ওপর একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ

হয়ে তার সাথে জনগণকে ভয় প্রদর্শন ও সাবধান করছে না (এবং তাঁর নবুওয়াতের দাবী যে সত্য, সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে না)[১]।'

পবিত্র কোরআন কাফির-মুশরিকদের এ ধরনের কথার তীব্র সমালোচনা করেছে।

সূরা আন'আমেও কাফির-মুশরিকদের এ ধরনের উক্তি (لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِمَ لَكُوَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا... – যদি না তার ওপর একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হত...)[২] তুলে ধরা হয়েছে। তাফসীরুল মীযানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সম্ভাব্য দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে : ১. তাদের এ ধরনের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, রাসূল (সা.) তাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং ফেরেশ্তারা তা আনয়ন করুক অথবা ২. স্বয়ং ফেরেশ্তারা প্রেরিত নবীর দায়িত্বভার গ্রহণ করুক এবং এ নবীর স্থলে তারাই জনগণকে ধর্মের দিকে আহ্বান জানাক (বা হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর আহ্বান যে সত্য, সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করুক)।[৩]

পবিত্র কোরআনে মুশরিকদের এ উক্তির জবাবে বলা হয়েছে : (وَ لَوْ جَعَلْنَاهُمَ لَكَّ الَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً)[৪] 'যদি (ধরে নেয়া যায় যে,) আমরা আমাদের রাসূলকে ফেরেশতা বানাতাম (অর্থাৎ ফেরেশতাকে রাসূল হিসেবে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করতাম) তাহলে তার (ফেরেশতার) ভিতরে যাবতীয় মানবীয় গুণ সৃষ্টি করা এবং তাকে মানুষের আকৃতি ও স্বভাব প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে যেত। অর্থাৎ রাসূল হিসেবে প্রেরিত এই ফেরেশ্তার অন্তর ও বাহির মানবসদৃশ করা অপরিহার্য হয়ে যেত।[৫] তাই এ কারণে উভয় অবস্থায় কোন পার্থক্যই আর বিদ্যমান থাকত না। আর যে ব্যক্তি নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরিত হবে তাঁকে অবশ্যই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং তাঁর মানবজাতি বহির্ভূত হওয়া সম্ভব নয়।

আল্লামা তাবাতাবাঈ এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানব সমাজের কাছে 'মানব রাসূল' প্রেরণ করার ফলে যে কল্যাণ অর্জিত হয় তদাপেক্ষা বেশি কল্যাণ

১. সূরা ফুরক্বান : ৭।
২. সূরা আন'আম : ৮।
৩. তাফসীরুল মীযান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০-২২।
৪. সূরা আনআ'ম : ৯।
৫. তাফসীরে নমুনা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬০-১৬২।

মানবজাতির ওপর কোন ফেরেশতাকে রাসূল হিসেবে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই।[১]

তাই পবিত্র কোরআনে ইসমাতসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় শর্ত ও যোগ্যতার অধিকারী কোন মানুষকে মানবজাতির কাছে নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা নিতান্ত স্বাভাবিক বিষয় বলেই গণ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ইসমাত আলোচনা করার পরই সংশ্লিষ্ট দলীল-প্রমাণাদির ওপর আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়।

৩. বিভিন্ন ধরনের ইসমাত (নিষ্পাপত্ব)

ইসমাতকে জ্ঞানগত বা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক– এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। এ দুই ধরনের ইসমাতকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব। আর নবী-রাসূলদের ইসমাত দু'ধরনের ইসমাতকেই শামিল করে। অর্থাৎ যিনি মাসুম (নিষ্পাপ) তিনি স্বীয় জ্ঞানগত পর্যায়ে যেমন ইসমাতের অধিকারী, ঠিক তেমনি আচরণ ও কর্মপর্যায়েও ইসমাত এর অধিকারী।

৪. ইসমাতের ধাপ বা পর্যায়সমূহ

ক. পাপমুক্ত থাকা : নবীদের ইসমাতের অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে তাঁদের পাপমুক্ত থাকা অর্থাৎ সব ধরনের পাপ ও গুনাহ থেকে পবিত্র থাকা। যে সব মানুষ অন্যদের হেদায়াতকারী (সুপথ প্রদর্শনকারী), তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ এবং মানবজাতির কাছে আল্লাহ্ পাকের ওহী আনয়নকারী তাঁদের অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ের পবিত্রতার অধিকারী হতে হবে। আর বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্ভিত্তিক দলীল-প্রমাণাদির আলোকে মহান নবীদের নিরঙ্কুশ ইসমাতই প্রমাণিত হয়। আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হচ্ছেন নবীকূল শিরোমণি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। সুতরাং এ পবিত্র আত্মার অধিকারীরা সব ধরনের পাপ ও কদর্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

---

১. তাফসীরুল মীযান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

খ. ওহী প্রাপ্তি ও রিসালাত অর্থাৎ ঐশী ধর্ম প্রচার করার ক্ষেত্রে ইসমাত : নবীদের ইসমাতের দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে ওহী প্রাপ্তি ও তার সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ঐশীধর্ম প্রচার করার ক্ষেত্রে মাসুম হওয়া যাতে তাঁদেরকে নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব সহকারে প্রেরণের লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং তা যেন কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। কারণ, এক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকলে নবীদের প্রতি জনগণের আস্থা থাকবে না।

গ. জীবনের দৈনন্দিন বিষয়াদি এবং শরীয়তের বাস্তব প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি করা থেকে মুক্ত থাকা : যে সব ক্ষেত্রে সব ধরনের ভুল-ত্রুটি ও স্খলন থেকে নবীদের মুক্ত, পবিত্র ও সংরক্ষিত থাকা অপরিহার্য সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে শরীয়তের বাস্তব ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি, যেমন নামাযের রাকাতসমূহ ভুলে যাওয়া ইত্যাদি থেকে তাঁদের মুক্ত থাকা, শীরয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা এবং দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে ভুল করা থেকে পবিত্র থাকা।[১] নবীদের জীবনের এ অংশও যেমন সব ধরনের ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি ও বিস্মৃতি থেকে সুরক্ষিত, ঠিক তেমনি তা তাঁদের ব্যাপক সর্বজনীন ইসমাতেরই অধীন।

যে সব অকাট্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্ভিত্তিক দলীল-প্রমাণ পরে বর্ণনা করা হবে সেগুলোর আলোকে মহান নবিগণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) উপরিউক্ত ক্ষেত্রত্রয়ে ইসমাতের অধিকারী অর্থাৎ মাসুম।

'তারকার শপথ যখন তা আস্তমিত হয়। তোমাদের সাথী (এ নবী) পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও নন'[২]– এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শেখ মুফিদ বলেছেন :

'এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁর (মহানবী) থেকে সকল পাপ-পঙ্কিলতা ও বিস্মৃতি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।'[৩]

যদিও মহানবী (সা.)-এর ভুল হওয়া (সাহ্উন্নাবী) সংক্রান্ত কথা প্রচলিত আছে এবং এতদপ্রসঙ্গে কিছু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, তবে অকাট্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্ভিত্তিক প্রমাণসমূহের আলোকে এ ধরনের রেওয়ায়াত ও হাদীসসমূহের সত্যতা

১. সূরা নাজ্ম : ১ ও ৩।
২. সূরা নাজ্ম : ১ ও ৩।
৩. শেখ মুফিদের রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩।

ও যৌক্তিকতা আর বিদ্যমান থাকে না। শেখ মুফিদ এ সব রেওয়ায়াত ও হাদীসের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করে বলেন :

'...মাসুমের ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি ও বিস্মৃতি যে আদৌ সম্ভব নয় এতদসংক্রান্ত অকাট্য বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে আমাদের (ইমামীয়া শিয়া মাযহাবের) দৃষ্টিতে নবীর ভুল-ভ্রান্তি সংক্রান্ত হাদীস ও রেওয়ায়াতসমূহ বাতিল ও এগুলোর কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই...।'[১]

তাহযীব গ্রন্থে শেখ তূসী বলেন : 'বুদ্ধিবৃত্তি (আক্‌ল) ও বিবেক এ ধরনের হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যান করে।'[২]

মহান আল্লাহ্‌র পরিচিতি, নবীদের জ্ঞান এবং নবী-রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ এ ধরনের হাদীস ও রেওয়ায়াতসমূহ যে বানোয়াট ও মিথ্যা তা স্পষ্ট করে দেয়। শেখ সাদূক (রহ.) বলেন : 'যারা নবীদের যে কোন বিষয়ে তাঁদের ইসমাত অস্বীকার করে আসলে তারা নবীদের ব্যাপারে অজ্ঞ...।'[৩]

আর আরেফদের (আধ্যাত্মিক সাধনাকারীদের) দৃষ্টিতে 'নবুওয়াত' ও 'ইমামত' পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্‌র খিলাফতের মাকাম ব্যতীত আর কিছুই নয় অর্থাৎ নবী ও ইমামই হচ্ছেন পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্‌র খলিফা। এ কারণেই পূর্ণমানব বা ইনসানে কামিলের (নিষ্পাপ নবী ও ইমামদের) মাঝে মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিকশিত ও প্রকাশিত হওয়া অপরিহার্য অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও মহিমার সমুদয় গুণের প্রকাশস্থল (مظهر) হচ্ছেন ইনসানে কামিল। আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমোলীর দৃষ্টিতে : 'এক্ষেত্রে খলিফাতুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের মাঝে নিরঙ্কুশ ইসমাতের (عصمت مطلقه) পূর্ণ প্রতিফলন ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।'[৪]

৫. মহান নবীদের ইসমাত সংক্রান্ত প্রমাণসমূহ

১. আল ইসতিবসার, ১ম ও ২য় খণ্ড (যৌথ খণ্ড), পৃ. ৩৬৭-৬৬৮।
২. তাহযীবুল আহকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।
৩. বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৭২।
৪. পবিত্র কোরআনের বিষয়ভিত্তিক তাফসীর, পৃ. ২৩৭।

মহান নবীদের ইসমাত সংক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্ভিত্তিক দলীল-প্রমাণাদি বিদ্যমান যেগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

ক. বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল : তাজরীদুল ই'তিকাদ গ্রন্থে ইসমাত সংক্রান্ত দলীল ঠিক এভাবে বর্ণিত হয়েছে : নবীর জন্য ইসমাত ওয়াজিব ও জরুরি যাতে (তাঁর ব্যাপারে) আস্থা অর্জিত হয় এবং পরিণতিতে নবী-রাসূল প্রেরণ করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হয়...।

শেখ তূসীর উল্লিখিত উক্তি আরও স্পষ্ট ও বোধগম্য হওয়ার জন্য আল্লামা হিল্লী বলেন : 'যাদের কাছে নবিগণ প্রেরিত হয়েছেন তারা যদি নবীদের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ও অপরাধ করা সম্ভব বলে জানে (ও বিশ্বাস করে) তাহলে তারা এ ধারণাও করবে যে, তাদের (নবীদের) দ্বারা ঐশী আদেশ-নিষেধ এবং কর্মকাণ্ডের বেলায়ও যে কোন ধরনের মিথ্যা ও পাপাচার সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এর ফলে তখন আর তারা নবীদের বিধি-নিষেধ মেনে চলা ও পালন করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে না।

উপরিউক্ত দলীল অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নবীদের ইসমাতের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করে এবং নবীদের ইসমাতের বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার আলোকে অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য বিষয় বলে প্রমাণিত করে। কারণ, এর ফলে জনগণ নবীদের বাণীর সত্যতার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারবে। আর সেই সাথে নবীদের ওপর মিথ্যা আরোপের অভিযোগ উত্থাপনের মত ধ্বংসাত্মক পাপ থেকেও তারা নিরাপদ থাকবে।

খ. কোরআন-সুন্নাহ্ভিত্তিক দলীল: পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু আয়াতে এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় যে, নবীদের ইসমাত একটি সুস্পষ্ট বিষয়। আলোচনার কলেবর ও ধারণা ক্ষমতার আলোকে নিচে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হলো। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

'আর নবী (সা.) নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিছু বলেন না; (যা কিছু তিনি বলেন) তা তার প্রতি প্রত্যাদেশকৃত ওহী ব্যতীত আর কিছু নয়।'[১]

১. সূরা নাজ্ম : ৩ ও ৪।

এ আয়াতের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-এর শরীয়ত যা তিনি ওহী হিসেবে লাভ করেছেন এবং জনসাধারণের কাছে প্রচার ও বর্ণনা করেন তা হচ্ছে সেই বিষয় যা মহান আল্লাহ্ তাঁর ওপর অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ এ স্থলে মহানবী (সা.) সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং সব ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও সংরক্ষিত (মাসুম)।

যে সব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান নবিগণ ওহী অর্থাৎ প্রেরিত প্রত্যাদেশ ও ঐশী বাণী (বিধি-বিধান) ইত্যাদি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সব ধরনের দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র অর্থাৎ তাঁরা ওহী প্রাপ্তি, সংরক্ষণ, প্রচার ও বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসমাতের অধিকারী, সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

'আপনার প্রভুর শপথ, সে পর্যন্ত তারা মুমিনই হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তারা আপনাকে নিজেদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি ও মীমাংসা করার জন্য বিচারক হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর আপনি যে বিচার ও ফয়সালা প্রদান করবেন সে ক্ষেত্রে তারা মনে কোন অসন্তোষ ও দ্বিধা পোষণ করবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেবে।'[১]

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

'যদি মহান আল্লাহ্র দয়া আপনার ওপর না থাকত তাহলে তাদের (জনগণের) মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী আপনাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করার ব্যাপারে (সাহস করত ও) চেষ্টা চালাত। আর তারা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাউকে বিচ্যুত করে না এবং তারা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ্ আপনাকে আপনার ওপর কিতাব (কোরআন) ও প্রজ্ঞা (হিকমত) অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা

১. সূরা নিসা : ৬৫।

জানতেন না তা আপনাকে শিখিয়েছেন। আর আপনার ওপর আল্লাহ্‌র মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।'[১]

আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমোলী উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : 'এ দুই আয়াতের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, একদিক থেকে ঐশী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নবীকে আল্লাহ্ পাক যে জ্ঞান দান করেছেন তার ভিত্তিতে জনগণের মাঝে বিচার করা ও ফয়সালা প্রদান। অন্যদিকে, সঠিক ও সুষ্ঠু বিচার কার্য পরিচালনা ও ফয়সালা প্রদানের বিষয়টি বিধি-বিধান ও আইনের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞানের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। আর এ বিষয়টি সূরা নিসার ১১৩ নং আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ও বোধগম্য হয়ে যায়।'[২]

আল্লামা তাবাতাবাঈ (রহ.) আল-মীযান গ্রন্থে এ দুটি আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : 'যে বিষয়ের মাধ্যমে ইসমাত বাস্তবায়িত হয় তা হচ্ছে এমন এক ধরনের জ্ঞান যা তার ধারককে পাপ ও ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে। অন্যভাবে বলা যায়, তা হচ্ছে এমন এক জ্ঞান যা বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করে। (وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) 'মহান আল্লাহ্ আপনার ওপর কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন'[৩]– এর অর্থ হচ্ছে কিতাব ও প্রজ্ঞা আপনার প্রতি ওহী করেছেন; আর এ ওহী হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর জন্য এক ধরনের ঐশী শিক্ষা (তালীম-ই ইলাহী)। তবে (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) 'তুমি যা জানতে (সক্ষম ছিলে)না তা আপনাকে আল্লাহ্ পাক শিখিয়েছেন'– এ আয়াতস্থ শিক্ষা বা জ্ঞানের অর্থ ঐ জ্ঞান (علم) যা ওহীর মাধ্যমে তিনি (সা.) অর্জন করেছেন। কারণ, সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তি ও মীমাংসা করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর বিচারকার্য পরিচালনা। আর বিবদমান পক্ষসমূহ এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফয়সালা প্রদানের আহ্বান জানাত। তাই উল্লিখিত দুই আয়াতের কাঙ্ক্ষিত অর্থ হচ্ছে দুধরনের জ্ঞান : ১. ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদান (تعليم) অর্থাৎ ওহীলব্ধ জ্ঞান এবং ২. মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের ওপর প্রক্ষিপ্ত জ্ঞান অর্থাৎ ইলহাম্‌লব্ধ জ্ঞান।'[৪]

---

১. সূরা নিসা : ১১৩।
২. পবিত্র কোরআনের বিষয়ভিত্তিক তাফসীর, পৃ. ২১৮-২১৯।
৩. সূরা নিসা : ১১৩।
৪. তাফসীরুল মীযান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৮০।

অতএব, উপরিউক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) দুধরনের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন : ১. এক ধরনের জ্ঞান যা বিচারকার্য পরিচালনা এবং রায় ও ফয়সালা প্রদানের উৎস; ২. আরেক ধরনের জ্ঞান যা যুক্তির প্রতিজ্ঞা ও উপপাদ্যসমূহের বিন্যাস ও বিষয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এ কারণে উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযূল এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে অভিযোগ পেশ করে প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ এবং প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। এ স্থলে এ আয়াত অবতীর্ণ হলে বাতিল (মিথ্যা) থেকে সত্য পৃথক হয়ে যায়। অতএব, উপরিউক্ত আয়াতসমূহ এবং আরও কতিপয় আয়াত যেগুলো উল্লেখ করার অবকাশ এখন নেই সেগুলো অনুসারে আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট।

মহান নবিগণ সবাই নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিলেন বিশেষ করে সেই সব নবী যাঁরা হচ্ছেন 'উলূল আযম' যাঁদের শীর্ষে রয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.), যিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইসমাত-এর অধিকারী। পবিত্র কোরআন মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যকে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য বলেই গণ্য করেছে। বর্ণিত হয়েছে :

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠

'যে রাসূলের আনুগত্য করে সে মহান আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা আপনাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করি নি।'[১]

ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : 'এ আয়াতটি হচ্ছে মহানবী (সা.) যে সকল বিধি-নিষেধ প্রদান করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত তার দলীল।... আর সকল কাজকর্মেও তাঁর মাসুম হওয়া অপরিহার্য ও জরুরি।'[২]

এ পর্যন্ত যে সব দলীল (বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক দলীল) উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, নবিগণ বিশেষ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি নিরঙ্কুশ ইসমাতের অধিকারী। এ কারণেই উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণাদির নিরঙ্কুশ ও সর্বজনীন হওয়ার

১. সূরা নিসা : ৮০।
২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রণীত আত্-তাফসীর আল-কাবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

আলোকে আমরা (ইমামীয়া শিয়া) বিশ্বাস করি যে, ইসমাত মহান নবীদের জীবনের সকল বিষয় ও দিককে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

এতদপ্রসঙ্গে জামীল্ হামূদ ঈসা (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ (...وجعلنى نبيّا و جعلنى مباركاً...) '(মহান আল্লাহ্) আমাকে নবী করেছেন এবং আমাকে তিনি বরকত ও কল্যাণময় করেছেন'...[১]– আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

'যদি আমরা ধরে নেই যে, মুহাম্মাদ (সা.) বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট ও পৃথক করে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে মাসুম নন তাহলে এর ফলে অনিবার্য হয়ে যাবে যে, তিনি মুবারক (বরকত ও কল্যাণময়) নন।'

৬. 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ'– এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ

অকাট্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক (নাকলী) দলীল-প্রমাণাদির আলোকে নবীদের নিরঙ্কুশ ইসমাত বর্ণনা ও প্রমাণ করার পর 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ'– এ আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করব। কারণ, এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। আর তা হলো যে, উপরিউক্ত আয়াতটি কি ঐ সব আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থকে সীমিত করে যেগুলোয় সকল নবী, বিশেষ করে মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ ইসমাতের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে? আর প্রশ্নকারী বিশেষ করে মহানবী (সা.)-এর ইসমাত সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন। আর প্রশ্নটা সঠিক বলে ধরে নিলে বলা যাবে যে, মহানবী (সা.) বিধি-বিধান বর্ণনা, প্রচার, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রেই কি কেবল মাসুম ছিলেন?

এ প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই বলতে হয় : যেমনভাবে নিরঙ্কুশ ইমামতের ইসমাতের দলীল-প্রমাণ ও প্রাগুক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নিরঙ্কুশভাবে মাসুম ছিলেন। অর্থাৎ ওহী প্রাপ্তি, সংরক্ষণ, প্রচার, কার্যকর ও বলবৎ করাসহ দৈনন্দিন জীবনের সকল বিষয়ে তিনি ইসমাতের অধিকারী ছিলেন।

(যেমনভাবে সূরা কাহ্ফ ও ফুস্সিলাতে বর্ণিত হয়েছে তদনুসারে) উপরিউক্ত আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতের মাঝে সর্বজনীনতা এবং বিশেষায়িতকরণের (সীমিতকরণ)

১. মারইয়াম : ৩০-৩১।

কোন সম্পর্ক বিদ্যমান নেই যার ফলে তা অবলম্বন করে কেউ আংশিক বা সীমিত ইসমাতের প্রবক্তা হতে পারে। আল্লামা তাবাতাবাঈ, তাফসীর আল-মীযানে সূরা কাহ্ফে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : 'আয়াতটি সীমাবদ্ধতা আরোপকারী পদ 'ইন্নামা' (اِنَّمَا=নিশ্চয়ই) দিয়ে শুরু হয়েছে। অন্য সকল মানুষের মত বা সদৃশ হওয়ার ক্ষেত্রেই কেবল মহানবী (সা.)-এর সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতে। অর্থাৎ বাড়তি কিছু তাঁর নেই; জাহেলি যুগে ধারণা করা হত যে, যে কেউ নবুওয়াতের দাবী করবে সে নিজেকে ইলাহ্ (উপাস্য) ও গায়েবী শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী বলেও দাবী ও জাহির করবে। এ কারণেই কাফির-মুশরিকরা এমন সব জিনিস দাবী করত যা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না অথবা তা করার ক্ষমতা রাখে না। মহান আল্লাহ্র অনুমতি ভিন্ন যে এ সব জিনিস তাঁর অধিকারে নেই, তিনি তা স্পষ্ট করেছেন। তিনি যে নবী এবং তাঁর কাছে ওহী করা হয়, কেবল এটাই তিনি ব্যক্ত ও প্রমাণ করেছেন।'[১]

সূরা ফুস্সিলাতে মুশরিকদের উক্তির জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : আর তারা বলল : 'আমাদের অন্তঃকরণ এমনই যে, তুমি (নবী) যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছ তা বোঝে না এবং আমাদের কর্ণকুহরে একটি ভারী পর্দা আছে যার ফলে তা এই আহ্বানের কোন কিছুই শুনতে পায় না। আমাদেরকে তোমার কাছে আসতে দেয় না।'[২]

এ কারণেই কাফির-মুশরিকদেরকে এ উক্তির জবাবে আয়াতটিতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমাদের মাঝেই আমি জীবন যাপন করি, তোমরা যেভাবে একে অপরের সাথে কথা বল। আমি তোমাদের থেকে ভিন্ন কোন প্রজাতির অন্তভুর্ক্ত নই যার ফলে তোমাদের ও আমার সাথে বিস্তর ব্যাবধান থাকবে।[৩] অর্থাৎ আমি তোমাদের মতই স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই কথা বলি। তবে তোমরা কেন আমার কথা বোঝ না? এতদভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটি অন্যান্য আয়াতের অন্তর্নিহিত ব্যাপক অর্থকে সীমিত ও বিশেষায়িত করে না। তবে এ সূরায় মুশরিকদের কতিপয় অমূলক ধারণা ও ভিত্তিহীন অজুহাত বাতিল করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মহানবী (সা.) যে একজন মানুষ এবং সেই সাথে তিনি যে

১. তাফসীরুল মিযান, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৪০৫।
২. সূরা ফুস্সিলাত : ৫।
৩. তাফসীরুল মীযান, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

আল্লাহ্পাকের নবী ও ঐশী বাণীর বাহক কেবল সেটাই এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

'নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ।'-আয়াতটির বিশেষায়িতকারী নিম্নোক্ত দুটি আয়াতও তাঁর নিষ্পাপতার প্রমাণ।

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

'রাসূল (সা.) যা তোমাদের জন্য আনয়ন করেন তা গ্রহণ কর এবং যা তিনি নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।'[১]

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

'তিনি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিছু বলেন না, (এবং) তা ওহী ব্যতীত কিছু নয় যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।'[২]

এ দুটি আয়াত মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ নিষ্পাপত্ব ও নির্ভুলতাকে প্রমাণ করে (তা বিধি-বিধান বর্ণনা ও প্রচারের ক্ষেত্রেই হোক বা বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হোক)।

ফলাফল

নবিগণ সবাই মাসুম (নিষ্পাপ)। আর মহানবী (সা.), যিনি উলূল আযম নবীদের অন্তর্ভুক্ত, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তিনিও নিরঙ্কুশ ইসমাতের অধিকারী। বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন-সুন্নাহ্ভিত্তিক দলীল প্রমাণাদির আলোকে মহান নবিগণ তথা মহানবী (সা.)-এর ইসমাত নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত হওয়ার কারণে তা ব্যাপক পরিসরে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়ে যায়। এ জন্যই 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ'– এ আয়াতটি মুখাস্সিস্ (বিশেষক) নয় অর্থাৎ এ আয়াতটি মহান নবিগণ এবং হযরত

১. সূরা হাশর : ৭।
২. সূরা নাজ্ম : ৩-৪

মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিরঙ্কুশ ইসমাতকে সীমিত করে না। শেখ সাদূক এতদপ্রসঙ্গে বলেন : 'আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, তাঁরা (নবিগণ) যেমন পূর্ণতার বিশেষণে বিশেষিত, ঠিক তেমনি তাঁরা বিদ্যা ও জ্ঞান দ্বারাও ভূষিত; তাঁদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এমনকি খুঁটি-নাটি ক্ষেত্রেও তাঁদের কোন ভুল-ভ্রান্তি, পাপ ও অজ্ঞতা নেই।'[১]

মূল : 'ধর্মবিষয়ক প্রশ্নসমূহের উত্তর' গ্রন্থের লেখকমণ্ডলী

অনুবাদ : মোহাম্মাদ মুনির হোসাইন খান

১. আয়তুল্লাহ্ জাফর সুবহানী প্রণীত মানশুরে জভীদ, খ. ৫, পৃ. ৪-১৭ ।

হজের দর্শন ও শিক্ষা

ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান

মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বুকে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আদম সন্তানদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে খাতামুন্নাবীয়্যিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) পর্যন্ত যুগে যুগে কত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছন আল্লাহ তাআলার তাওহীদ, উলুহিয়াত (প্রভুত্ব) এবং তাঁর রুবুবিয়াত তথা একমাত্র প্রতিপালক, আইনদাতা, রিযিকদাতা ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিকের আসনে সমাসীন করার জন্যই আগমন করেছেন। সকল নবীর দাওয়াত একই ছিল। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ

'...আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে (খোদাদ্রোহী) অস্বীকার কর।' (সূরা নাহল : ৩৬)

হযরত আদম (আ.) থেকে রাসূল (সা.) পর্যন্ত সকলের দীন ছিল আল্লাহ তাআলার মনোনীত দীন ইসলাম। এরশাদ হয়েছে :

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ

'ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন (জীবনব্যবস্থা)।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

আমরা যদি আল-কুরআন ও রাসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নাতের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাব যে, এ খোদায়ী দীন আল ইসলাম তিনটি মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এক. আকায়িদ, দুই. ইবাদত, তিন সিয়াসাত। আকায়িদের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে :

১. মহান আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা তাঁর একক ও সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর ঈমান;

২. রিসালাতের ওপর ঈমান তথা সকল নবী-রাসূল একই দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য দীন নিয়ে এসেছেন তার ওপর ঈমান;

৩. আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান;

৪. আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাকুলের প্রতি ঈমান;

৫. তাকদিরের ওপর ঈমান;

৬. আখিরাত বা পরকালের ওপর সুদৃঢ় ঈমান (কবর, হাশর, মিজান, পুলসিরাত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নামের ওপর ঈমান এর মধ্যে শামিল রয়েছে।)

দ্বিতীয় মূলনীতি ইবাদতের মধ্যে রয়েছে :

- জীবনের সর্বক্ষেত্রে নামায প্রতিষ্ঠা করা ;
- যাকাত প্রদান। আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক তথা জীবনোপকরণের যাকাত, সাদাকা প্রয়োজনে সবকিছু তাঁরই রাস্তায় ব্যয় করা;
- রোযা পালন করা;
- হজ পালন করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা।
- আকায়িদ ও ইবাদতের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এগুলোর যথাযথ পালন ও বাস্তবায়নের প্রধান উপকরণ ও বাহন হলো সিয়াসাত বা রাজনৈতিক মূলনীতিসমূহ। এসব মূলনীতির মধ্যে রয়েছে :
- আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়াত তথা সার্বভৌমত্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা;
- রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিক কাজকর্ম চাই তা ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক বা আন্তর্জাতিক জীবন হোক না কেন তার আদর্শ হবেন রাসূলগণ, তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতিই হবে জীবন পদ্ধতি।

ইমামত বা ফিলাফত

আমরা যদি সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি অনুধাবন করি তাহলে দেখতে পাব এসব মূলনীতি একই লক্ষ্যে কাজ করছে, একই লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। আর তা হলো- কালেমা .... (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। কুরআন মজীদে যার নাম রাখা হয়েছে কালেমা তাইয়্যেবা। এরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

'আপনি কি লক্ষ্য করেননি আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন? কালেমা তাইয়্যেবা একটি পবিত্র স্বচ্ছ-বলিষ্ঠ-তাজা উত্তম বৃক্ষ যেন। তার মূল (মাটির) গভীরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং তার শাখা-প্রশাখা মহাশূন্যে (বিস্তীর্ণ)। তা সব সময় তার আল্লাহ-মালিকের অনুমতিক্রমে ফল প্রদান করে থাকে।'- (সূরা ইবরাহীম : ২৪-২৫)

এ তাওহীদের কালেমার চারটি শাখা রয়েছে।

১. মূল সত্তার ক্ষেত্রে একত্ব।

২. গুণের ক্ষেত্রে একত্ব

৩. আইন-বিধান-অধিকারের ক্ষেত্রে একত্ব

৪. ইবাদাত-বন্দেগি পাওয়ার ক্ষেত্রে একত্ব।- (হুজ্জাতাল্লাহিল বালেগা)

মহান আল্লাহ তাওহীদকে মানুষের শরীর ও আত্মার মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিতত করার জন্যই ইবাদতসমূহ ফরয করেছেন। মানুষ নামাযে ... (আল্লাহ মহান) ও ... (সর্বোচ্চ প্রতিপালকের জন্যই সকল পবিত্রতা) এ ঘোষণা দান এবং রুকু ও সেজদার মাধ্যমে শারীরিক ও আত্মিকভাবে আল্লাহ তাআরার প্রভুত্ব ও রুবুবিয়াতের স্বীকৃতি দেয়। সে ঘোষণা করে-

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

'আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টার প্রতি একনিষ্ঠভাবে আমি আমার মুখ ফেরালাম। আমি মুশরিক নই।' (সূরা আনআম : ৭৯)

সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করে নিজের অস্তিত্বকে দাতা দয়ালু আল্লাহর সমীপে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু এ রুকু ও সেজদার পরও তার মাঝে ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তি ও মোহ অবশিষ্ট থাকে।

এই সম্পদের লোভ-লালসাকে দূর করার জন্যই আল্লাহ তাআলা যাকাত ফরয করেছেন। যাতে মানুষ যাকাত, খুমস ও সাদাকা আদায়ের মাধ্যমে ধন-সম্পদের মোহমুক্ত হতে পারে। সে প্রমাণ করতে পারে, জীবন ও সম্পদ একমাত্র মহাপবিত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

এ ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার পরও মানব অস্তিত্বে রিপুর তাড়না ও মোহ একেবারে নিঃশেষ হয় না। তাই হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা, আত্মগর্ব, রিয়া বা লোকদেখানো মনোভাব, প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ তথা এ জাতীয় সকল প্রকার রিপু ও বদ অভ্যাস থেকে মানুষকে পূত-পবিত্র করার জন্যই আল্লাহ তাআলা রোযা ফরয করেছেন। এ সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই মানুষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান লতিফাসমূহ কু-অভ্যাস ও সকল প্রকার কালিমামুক্ত হয়। এসব কালিমার স্থলে স্থান পায় ঈমান ও ইয়াকীনের নূর।

শারীরিক ইবাদত নামায, আর্থিক ইবাদত যাকাত ও খুমস এবং আত্মিক ইবাদত রোযা পালনের পর মানুষের শরীর, প্রাণ, কলব ও রুহ তার প্রিয়তম প্রভু এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মালিককে দেখার ও তাঁর নৈকট্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে চায় একজন মুখলেস, অনুগত ও আদর্শ বান্দা হিসাবে নিজেকে তার মা'বুদের সামনে হাজির করতে। চায় স্রষ্টার ঘরকে দেখতে, মহান প্রভুর কুদরত ও শক্তির নিদর্শনাবলি নিজ চোখে অবলোকন করতে। এমন একটি স্থান সে খোঁজে যেখানে নিজের সকল আকুতি ও অন্তরজ্বালা ব্যক্ত করতে পারে। সে চায় বিশ্বের সকল যথার্থ নামাযী, যাকাত দানকারী, রোযাদারকে একই স্থানে দেখতে, সৌহার্দ্য,

ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে পরস্পরে একাকার হতে। দুনিয়াকে জান্নাতুল ফেরদাউসে পরিণত করতে।

মহান রাব্বুল আলামীন যেহেতু ... অন্তর্যামী, তাই তিনি তাঁর প্রেমে পাগল বান্দাদের মনের এসব আরজু ও আকুতি পূরণের জন্য ফরয করেন হজ। এ অনুষ্ঠানে এসে মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পায় তার মা'বুদের ঘরখানা নিজের বুকে জড়িয়ে ধরেছে তার আশেকদেরকে। অন্তরের সকল জিজ্ঞাসা, চাওয়া-পাওয়া ও ফরিয়াদের জবাব দিচ্ছে। তার চোখের সামনে দিবালোকের ন্যায় ভেসে ওঠে ইতিহাসের এক বিশাল জগৎ। যার ব্যাপ্তি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সে দেখতে পায় 'খলিল' উপাধিতে ভূষিত আল্লাহর এক একনিষ্ঠ ও অনুগত বান্দা তাঁর মাশুকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে নমরুদের প্রজ্বলিত লেলিহান শিখায় সঁপে দিচ্ছেন। আর প্রেমিরে প্রতি অসীম দয়া ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে যখন আল্লাহ সে অগ্নিকুণ্ডকে পরিণত করেছেন গুলিস্তানে। আগুনকে লক্ষ্য করে বলছেন-

قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

'বললাম, হে অগ্নি! ইবরাহীমের জন্য হয়ে যাও শীতল ও শান্তিদায়ক।'- (সূরা আম্বিয়া : ৬৯)

সে আরো দেখতে পায়, কি করে হাজেরা নামে এক মহীয়সী নারী আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সামনে নিজেকে বিলীন করছেন। মক্কার ধূসর মরুতে পানি, ফলমূল ও খাদ্যবিহীন অবস্থায় পাথরকণার মাঝে কয়েকদিনের শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে থেকে যাচ্ছেন। স্বামী ইবরাহীম বিদায় হচ্ছেন, হাজেরা প্রশ্ন করছেন- 'এ কি আপনার সিদ্ধান্ত, না আমার মা'বুদের হুকুম।' ইবরাহীম (আ.) জবাব দিচ্ছেন- 'ইবরাহীম তার মাশুকের নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করে না।' উত্তর শুনে হযরত হাজেরা (আ.) সহাস্যে জবাব দিলেন : 'আলহামদুল্লিাহ।'

এ বিদায়ে নেই কোনো অভিযোগ, নেই চিন্তার লেশ। যেমন স্বামী আল্লাহর খলিল তেমনই স্ত্রী আল্লাহর আশেক। একজন হাজী আরো দেখতে পায়, একজন মা তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। তৃষ্ণার্ত শিশু ইসমাঈলের মুখে এক ফোটা পানির জন্য সাফা-মারওয়ায় ছুটাছুটি করছেন। কোথাও একটু পানি পাওয়া যায় কিনা এজন্য তাঁর এ সাধনা।

যখন একজন মা জনমানব শূন্য মরুতে কয়েকদিনের শিশুর তৃষ্ণার্ত ব্যাকুল মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, শিশু পানির জন্য জিহ্বা বের করে মাকে দেখাচ্ছে, মায়ের স্তনের দুধও শুকিয়ে গেছে, শিশুর চাঁদ মুখ মলিন হয়ে যাচ্ছে, মরুর তপ্ত লু-হাওয়া এ তৃষ্ণাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে- সে করুণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য কোনো যা কি সহ্য করতে পারে? পানির জন্য পাথরের পিচ্ছিল পাহাড়ে ছোটাছুটি করে পানি না পেয়ে যে অবস্থা হওয়ার কথা তাকি বর্ণনা করা যায়? কিন্তু ঈমানের প্রতীক মা হাজেরা এ কঠিন অবস্থায়ও অবিচল, শঙ্কামুক্ত।

একজন খোদার ঘরের মেহমান দেখতে পায় ধৈর্যশীল ও সামর্থ্যানুযায়ী প্রচেষ্টকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলার কুদরত ও রহমত কিভাবে বর্ষিত হয়। ইসমাঈলের পায়ের নিচ থেকে উত্থিত যমযম কিভাবে সেদিনের হাজেরা-ইসমাঈল থেকে শুরু করে আজকের লক্ষ লক্ষ আশেকের মনের জ্বালা-তৃষ্ণা নিবারণ করছে। যে রহমত ও কুদরতের কোনো সীমা নেই। যতদিন দুনিয়া থাকবে এ 'যমযম' অফুরন্ত ও অপরিবর্তনীয় থাকবে। একজন খোদাপ্রেমিক তার মাশুকের এ কুদরত দেখে তার মনের চেতনাকে শাণিত করতে যে দেরী হয় না এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহর মেহমান আরো দেখে, একজন প্রায় শত বছরের বৃদ্ধ পিতা ইবরাহীম একটি মাত্র সন্তান, আল্লাহর নির্দেশে নিজেই পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন। আল্লাহু আকবার ... ধ্বনি দিয়ে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে কুরবানী করছেন। আল্লাহপ্রেমের এ ইতিহাস এ দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাস কোনোদিন কি প্রত্যক্ষ করেছে?

অপরদিকে নয় বছর মতান্তরে ১৩ বছরের কিশোর ইসমাঈল বাবার মুখে আল্লাহর নির্দেশের কথা শুনে হাসিমুখে বলছে-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢

'হে আব্বা! নির্দেশ যা হয়েছে তাড়াতাড়ি সম্পাদন করুন- আমাকে আল্লাহর ইচ্ছায় ধৈর্যশীল হিসাবে পাবেন।' (সূরা সাফফাত : ১০২)

আল্লাহর ঘরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘর নির্মাণ করেও নিজেদের কোনো কর্তৃত্ব জাহির করছেন না। বরং অবনত মস্তকে ফরিয়াদ করছেন-

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

'পরওয়াদিগারে আলম! আমাদের এ খেদমত কবুল করুন, আপনি যে সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।' (সূরা বাকারা : ১২৭)

মহান আল্লাহ তাঁর ঘরের পাশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন অংকিত পাথরকে মাকামে ইবরাহীম হিসাবে নির্ধারণ করে এ আদর্শ পরিবারের ইতিহাসকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত ইতিহাস হিসাবে সংরক্ষণ করেছেন। এ পরিবার নিজের সবকিছু আল্লাহর নামে বিলীন করে ঘোষণা দিয়েছিলেন-

قُلْ . إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾

'আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই নিবেদিত।' (সূরা আনআম : ১৬২)

আল্লাহর ঘরের মেহমান হাজীরা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবারে এ ধারাবাহিক ইতিহাসের এই জীবন্ত চিত্র দেখে নিজেকে নবী ইবরাহীমের মতো, স্ত্রীকে হযরত হাজেরা (আ.) আর সন্তানদেরকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মতো করে গড়ে তুলবে এটাই হজের বিশেষ দর্শন ও শিক্ষা।

একজন হাজী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুকরণে তার পরিবারকে গড়ে তোলার পর নিজেদের পরিবেশ, সমাজ ও দেশকে মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে। আজকের ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মতো লক্ষ লক্ষ মুসল্লির উপস্থিতিতে জুমআ নামাযের ইমামগণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করবেন আর সর্বস্তরের জনগণের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সমস্যার সমাধান করবেণ। নারী-পুরুষের গগনবিদারী ফরিয়াদ ও তেজোদ্দীপ্ত উদ্যোগের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করবেন।

দীর্ঘ নয় মাস উদ্যম, উচ্ছাস ও মহব্বত নিয়ে অপেক্ষায় থাকবেন বাইতুল্লাহ আল হারামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাইদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে ঐক্যের বুনিয়াদ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। আল্লাহর ঘরের আঙিনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক

বিষয়াদি উত্থাপন, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পবিত্র পরিবেশে পরামর্শের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান এবং মুসলিম বিশ্বের উন্নতি-অগ্রগতির পথ নির্ণয় করবেন এটাই হবে হজের মূল চেতনা। একজন মুমিন আরব, অনারব, সাদা, কালো, ইরানী, বাঙালি, মিশরী, এশিয়ান, ইউরোপীয়, আফ্রিকান তথা বিশ্বের যে কোনো স্থানেরই হোক না কেন, তার সকল ভাষা, বর্ণ, গোত্রের পরিচয় ভুলে গিয়ে এ ময়দানে পরস্পরে হবে ভাই, এখানে সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সবাই হবে সমানভাবে শরীক। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন :

أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

'সৎকর্ম ও তাকওয়ার ভিত্তিতে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।' (সূরা মায়েদা : ২)

রাসূলে করীম (সা.) এরশাদ করেন : 'মুমনি একই দেহের মতো যখন একটি অঙ্গে ব্যথা হয় পুরো দেহে তা অনুভূত হয়।' হজের এ পবিত্র অঙ্গনে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ... 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজুরাত : ১০) সবাই তাওহীদের রজ্জুতে গ্রথিত এ সত্য দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়।

বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতি সমাজ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত। মুসলমানদের অর্থনৈতিক বিষয়াদি ও জীবন যাপন সমস্যা এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন হজে অবশ্যই উত্থাপিত হতে হবে। বিশ্ব মুসলিমের প্রাকৃতিক, খনিজ সম্পদ, জনশক্তি, কারিগরি, প্রযুক্তি অর্থনৈতিক তথা সকল শক্তি, সামর্থ্য নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা সাপেক্ষে মুসলিম উম্মাহর অগ্রগতির বাস্তব সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা আরাফাতের ময়দান থেকে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে হজ হবে অপূর্ণাঙ্গ।

মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতবিরোধ তাদেরকে দুর্বল করে দেয়ার বড় উপাদান। ইসলামের দুশমনরা এ কাজে সকল প্রকার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবিরোধ আন্তর্জাতিক হজ কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা ও সমাধান হওয়া উচিত। এ পবিত্র পরিবেশে হজ অনুষ্ঠানে যদি এসব সমাধান না করা যায় তাহলে হজ হবে প্রাণহীন। এ হজ হবে এমন এক প্রাণহীন শরীরের মতো যা অচল।

তবে এসব উদ্যোগ তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন হজ হবে ইবরাহীমী হজ। হজ হতে হবে সকল প্রকার প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শিরক থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾

'স্মরণ করুন, যখন আমি ইবরাহীমের সেই গৃহের স্থান নির্বাচন করে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো শরীক কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা নামাযে দাঁড়ায় ও সিজদা করে।' (সূরা হজ : ২৬)

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

... হজে গমন সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হজ হতে হবে শর্ত ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত। একজন মানুষ তার ফরয আদায় করবে এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অধিকার কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের নেই। হজ অবশ্যই সকল প্রকার জীবিত ও মৃত নাপাকী এবং মূর্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

'তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা বলা হতে।' (সূরা হজ : ৩০)

একজন মুমিন যখন আল্লাহর ঘর যিয়ারতে আসেন এবং গগনবিদারী আওয়াজে যখন বলেন : 'হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির, হাজির (হয়ে বলছি) আপনার কোনো শরীক নেই। হাজির আমি। প্রশংসা আর নেয়ামত আপনারই আর ক্ষমতাও আপনার। যাতে নেই কোন শরীক।'

যখন সে এই ঘোষণা দেয় তখন তার মন-মানসিকতা ও শরীর রাসূলের পবিত্র হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া মূর্তিগুলোর ভেঙে চুরমার করতে প্রস্তুত হয়। আল্লাহর ঘোষণা :

جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।'

এ কথা মুখে উচ্চারণ করে দীপ্ত শপথ গ্রহণ করে। সে সিদ্ধান্ত নেয় মুসলিম জাতির মাথার ওপর আল্লাহ ছাড়া যত প্রকারের ভূত বসে আছে সবগুলো আছড়ে মারবে। যেসব সরকার তাগুতের সাথে আসস করে মুসলিম মিল্লাতের ক্ষতি করছে শাণিত কৃপাণ হাতে নিয়ে আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে তাদের শিকড় উপড়ে ফেলবে।

হজ অনুষ্ঠানে মুসলিম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, যায়নবাদ ও পুঁজিবাদের মতো সকল তাগুতী মাতদর্শকে জাহান্নামের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে, বজ্রনিনাদে ঘোষণা করবে–

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

'এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত চিরকালের জন্য আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ চলতেই থাকবে।' (সূরা মুমতাহিনা : ৪)

এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন হজের খোতবা আজ হারিয়ে গেছে। মুসলিম জাতির উচিত সেদিনকে স্মরণ করা যেদিন ইলমের শহর .. চিরবিজয়ী শেরে খোদা .... হযরত আলী বিন আবি তালিব (আ.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে আরাফাতের ময়দানে রাসূলে করীম (সা.)-এর পক্ষ হতে সূরা বারাআত ... তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। সেদিনের এ আরাফাতের খোতবায় আল্লাহ তাআলার বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে কাফের ও অমুসলিমদের সাথে আপস চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আজ যদি আল্লাহর নবী আমাদের মাঝে থাকতেন তাহলে কী করতেন? যেসব মুসলমান কাফের ও তাগুতের সাথে আপস করছে তাদেরকে কি মুসলমান হিসাবে গণ্য করতেন? একজন মুমিন কি করে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে? অথচ মহান আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে–

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ

'যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না।' (সূরা বাকারা : ২৫৬)

মুশরিক ও কাফেরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া একজন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হতেই পারে না।

আমরা যদি ইতিহাসের পাতা উলটাই কী দেখতে পাই– সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন বিন আলী (আ.) হজ অনুষ্ঠানের আগে মক্কা থেকে কারবালার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। তাঁর সাথী-সঙ্গীদের অনেকেই বললেন- 'হযরত হজ সন্নিকটে, আপনি হজ আদায় করে রওয়ানা হতে পারেন।' তিনি জবাবে বললেন : ' যে হজ ইয়াযীদের মতো শাসকের নেতৃত্বে হচ্ছে সে হজ প্রকৃত ইবরাহীমী হজ নয় মুসলিম উম্মাহর মাথার ওপর একজন অত্যাচারী বসা থাকা অবস্থায় কিভাবে হজ হতে পারে?' তিনি হজ অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কুফার দিকে রওয়ানা হলেন। আমরা যদি ইমাম হুসাইন (আ.)-এর অনুসারী হই- বর্তমান বিশ্বে যেভাবে সর্বগ্রাসী তাগুত আমাদের ওপর চেপে বসেছে, আমাদের জান, মাল, ইজ্জত, সব ভূলুণ্ঠিত করছে কি করে আমরা চুপ থাকতে পারি? আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব জনশক্তি আমাদের হাতে, আমরা বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। তেল, গ্যাসসহ অঢেল খনিজ সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে, স্থলভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা আমাদের দখলে। এতদসত্ত্বেও কেন আজ আমরা ঘুমিয়ে আছি? বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মানুষ কেন আজ জীবন দিচ্ছে? তাদের ইজ্জত সম্মান দিনের পর দিন কেনই বা নিঃশেষ হচ্ছে? যুগের পর যুগ ধরে ফিলিস্তিনের নারী, শিশু, কিশোরের বুকফাটা কান্না, গগনবিদারি ফরিয়াদ শুনেও কেন আজ আমরা মৃতবৎ নীরব। আলজেরিয়া, কাশ্মীর, আরাকান, মিশর, সোমালিয়া, ভারতের অসহায় মুসলমানরা কেন আজ অত্যাচারের স্টীমরোলারে নিষ্পেষিত হচ্ছে? এর কারণ কী? কেন আমরা এ নিয়ে ভাবছি না? আমরা কি আল্লাহ তাআলার সেই বাণী ভুলে গেছি? যেখানে বলা হয়েছে-

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾

‘তোমাদের কি হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করছ না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য? যারা বলে- হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ হতে আমাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নাও যার অধিবাসী জালেম, তোমার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে কাউকে বানাও আমাদের সাহায্যকারী। (সূরা নিসা : ৭৫)

সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের এ দুর্গতি, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমানের কারণ হলো উম্মতের দুর্বলতা, সমগ্র কুরআনের ওপর আমল না করা, আর মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্য।

কুরআনের কোনো অংশকে মেনে নেয়া, আবার কোনো অংশকে কাফের ও মুনাফিকদের সন্তুষ্টির জন্য বাদ দেয়ার ফলে নেমে এসেছে আজকের এ অপমান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٍۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡىٌ فِى ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿٨٥﴾

‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? আর তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং কিয়ামতের দিন ত ারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সমস্ত সম্বন্ধে অনবহিত নন।’ (সূরা বাকারা : ৮৫)

আল্লামা ইকবাল বলেন,

আকল হলো তব ঢাল, এশক তোমার শাণিত কৃপান;
দরবেশ আমার, খেলাফত তোমার সারা জাহান;
আল্লাহ ছাড়া সব নাশিতে তাকবির তোমার বহ্নিশিখা,
মুসলিম তুমি তদবির তোমার তকদিরেরই সব লেখা;
ভক্ত হলে মুহাম্মাদের তুমি-আমিও তোমার;
এ জগৎ কিসের, লৌহ-কলম সবই তোমার।'

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আয়াতুল্লাহ খোমেইনী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের ফরে ইবরাহীমী হজ পালনের চেষ্টা চলছে বিশ্বব্যাপী। বিপ্লবী ভূমি ইরান থেকে উত্থিত ... (আল্লাহু আকবার) ধ্বনি সারা বিশ্বে প্রতিফলিত হচ্ছে। বড় ও ছোট সকল শয়তান এ আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ আওয়াজ স্তব্ধ হবার নয়। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন-

وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

'আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (সূরা কাহফ : ৮)

বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি ফরয হজকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো আদায় করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের আল-কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

বাইতুল্লাহর সামনে এবং রাসূলের পবিত্র রওজা সামনে নিয়ে আল্লাহর সাথে এ মর্মে ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে যে, আমরা কখনও ইসলামের কোনো প্রকার দুশমনের সাথে আপস করব না। নিজেদের ছোটখাটো মতবিরোধ পরিহার করব। মুসলমানদের উন্নতি, অগ্রগতি ও নিরাপত্তা বিধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেব। সকল মুসলমানকে নিজের ভাই মনে করব। আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, দেশ বা শক্তিকে কোনো শক্তি হিসাবে গণ্য করব না। বাইতুল্লাহর পবিত্র অঙ্গনকে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের কেন্দ্রে পরিণত করব। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ

'আল্লাহ তাআলা কাবাকে করেছেন সম্মানিত এবং (আল্লাহর নির্দেশ পালনে) মানুষের উত্থানের কেন্দ্র হিসাবে।' (সূরা মায়েদা : ৯৭)

আমরা শপথ করব কোনো অবস্থাতেই কুফর, শিরককে ঈমানের সাথে স্থান দেব না, সকল তাগুত, মানুষ ও জ্বীন শয়তারেন বিরুদ্ধে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেব। এ সংকল্প ও শপথ যদি ঠিক রাখতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ ইবরাহীমী হজ আবার পুনর্জীবন লাভ করবে। মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য মজবুত করে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব ইনশা আল্লাহ।

ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

শের কাভান্দ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে এবং তাঁদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।' (সূরা হাদীদ : ২৫)

ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ে মানবতা নির্দিষ্ট কিছু ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিকশিত হয়েছে। সংস্কৃতি এই মানবতা থেকেই উৎসারিত। এমন কোন জাতি নেই যাদের কোন সংস্কৃতি নেই। বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই সকল সংস্কৃতি বেড়ে ওঠে ঠিক যেমন শেকড় থেকে খাদ্য নিয়ে একটি গাছ বড় হয়ে ওঠে।

ইরান দেশটা অনেক সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার। তবে ইরানে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় ইসলাম আসার পর। ইসলাম আসে ইরানে মুক্তির বার্তা নিয়ে। ইসলামের আদর্শে প্লাবিত হয়ে ইরান থেকে শ্রেণিবৈষম্য দূর হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। তৎকালীন ইরানে ইসলামের আবির্ভাব ছিল শুষ্ক মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের ন্যায়।

সৃষ্টির ঐক্য এবং জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং সৌজন্যবোধের আলোকে ইসলাম দৃপ্ত কণ্ঠে এই ঘোষণা দেয়ার প্রয়াস পায় যে, জাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ এবং বর্ণবাদ দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে জাতিসমূহের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ইসলাম এই সকল বাধা অপসারণ করে মানবজাতির মাঝে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং পরস্পরকে আরো গভীরভাবে জানার ও বুঝার জন্য আহ্বান জানায়।

পাক কুরআনে বলা হচ্ছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।' (সূরা হুজুরাত : ১৩)

ইসলামের এই উদারতা মানব সংস্কৃতির সকল জড়তাকে অপসারিত করে নব সৌরভে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, এক ইরানী মুসলিমের হাতে আরবি ব্যাকরণের উন্নয়ন ঘটেছে।

আমরা দেখেছি, মুসলিম স্পেন বা মুসলিম আফ্রিকার বিজ্ঞানীরা জ্ঞান সাধনা এবং জ্ঞান আহরণের জন্য পৃথিবীর দূর-দূরান্তে ছুটে গেছেন। মোটের ওপর আমরা দেখতে পাই, ইসলামের স্বর্ণযুগে সকল মুসলিম দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করেছেন এবং মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের এই সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল ইসলামের মহানবী (সা.)-এর অনুপ্রেরণা। কেননা, তিনিই বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।'

আরবি ব্যাকরণের উৎকর্ষ সাধনে সিবোইয়েহ (Sibooyeh), সমাজ বিজ্ঞানের ফয়েজ কাশানী, গাজ্জালী, তূসী, ভেষজ এবং চিকিৎসাবিদ্যায় ইবনে সীনা, রাযী, রাজনীতি ও নীতিবিদ্যায় নাসিরুদ্দীন তূসী, ইতিহাসে ইবনে খালদুন, নৃতত্ত্ব এবং ভূগোলবিদ্যায় যাকারিয়া কাযভিনী, সাহিত্যে ইবনুল আমিদ, হস্তলিপিবিদ্যায় ইবনুল বাভবার, চারুকলায় আবুল ফারাজ ইসফাহানী ও এরমাভী, কাব্যে ফেরদৌসী, সাদী, হাফেজ, রুদাকী, খাকানী এবং আবদুল ফাত্তাহ বাস্তী, দর্শনশাস্ত্রে ফারাজী, আল-কিন্দী, ইবনে সীনা, বিরুনী, সোহরাওয়ার্দী, মোল্লাহ সাদরা এবং আল্লামা তাবাতাবাঈ, স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানী, আবদুহু কাওকাবী, ইকবাল, শরিয়তী, ইমাম খোমেইনী (রহ.) প্রমুখ এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরো অনেক বিশ্ববিখ্যাত বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ইসলামের কালজয়ী চিন্তাধারায় গঠিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বিশ্বজনীন ইসলামী আদর্শই এই সকল প্রতিভাকে

মানবজাতির কাছে উপহার দিয়েছে। ইসলামের মহান শিক্ষা মুসলমানদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মপন্থায় প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি মানব প্রকৃতির সাথে এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মানবতার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইসলাম মিশে আছে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নিজেই এর সমন্বয় সাধন করেছেন।

কোন সংস্কৃতিই পৃথিবীর বুকে বিকাশ লাভ করতে পারে না যদি না মানব প্রকৃতির সাথে তার সংগতি থাকে। সংস্কৃতি যতই মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে ততই এটি গুতশীল হয়ে সমকালীন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে এবং মানব সম্পর্কের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবে। এখানেই ইসলামী সংস্কৃতি আর অন্যান্য সংস্কৃতির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান।

ইসলামী নীতিমালা, মূল্যবোধ, অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুশাসনসমূহ সুস্পষ্টভাবে মানুষের মুক্তির কথাই বলেছে, জ্ঞানচর্চার বিশাল দিগন্ত পানে মানুষকে আহবান জানিয়েছে, মানুষের দৃষ্টিপাতের সকল বাধা অপসারিত করেছে যেন মানুষ এই বিশ্ব রহস্যের উদ্যোগ ও বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারে।

ইসলামের আদর্শে স্নাত হয়ে মুক্ত মানুষের মধ্য থেকে জ্ঞানের ফলগুধারা প্রবাহিত হয়। তার মাঝে সৃষ্টিশীল প্রেরণা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। নতুন নতুন শিল্প-সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উদ্ভাবনে সে ব্রতী হয়। তার সৃষ্টিকর্মে এই পৃথিবী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

জ্ঞানের মূল্যবোধ, তাকওয়া, জিহাদ, আনুগত্য, আত্মোৎসর্গ এবং সহিষ্ণুতা মানুষকে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যে আন্দোলনের মাধ্যমে সে নতুন মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে, স্রষ্টার সৃষ্টিকে সুশোভিত করে তোলে। এর ফলে মানুষের প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা, শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা এবং শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতা স্রোতস্বিনীর মতোই প্রবাহিত হয়। তাওহীদের আশ্রয়ে এটি প্রবহমান হয়ে মানবতা ও মানব পরিচিতির বিকাশ সাধন করে এবং পারস্পরিক বৈষম্য ও হিংসা-বিদ্বেষের সীমারেখাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ইসলামী সংস্কৃতি উঁচুমানের অর্থাৎ ক্লাসিকধর্মী এই কারণে যে, এতে রয়েছে সংহতি, সুদৃঢ়তা, মানবশৌর্যের প্রকাশ, জীবনক্ষেত্রে মানুষের কার্যকর ভূমিকা এবং তার অদৃষ্ট সম্পর্কে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

ইসলামী সংস্কৃতি রোমান্টিক এই অর্থে যে, এটি বিশ্বাসী জনগণের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাস দ্বারা তা বিমণ্ডিত।

ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবধর্মী। অর্থাৎ বাস্তবতা ও প্রকৃতিবিবর্জিত সকল বিপথগামী মূল্যবোধের বিরোধী এই সংস্কৃতি। স্বৈরাচার আর নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ইসলামী সংস্কৃতি সকল দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সেটা সামাজিক আনাচারই হোক বা শ্রেণিবৈষম্যই হোক কিংবা বর্ণবৈষম্যই হোক।

ইসলামী সংস্কৃতি সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও বিকৃতির বিরোধী। মানুষকে দেবতা জ্ঞান করা, আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা- সকল প্রকার মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকৃতি ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী।

বিশ্বজনীন ইসলামী সংস্কৃতির অবকাঠামো দৃঢ় প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে রয়েছে মানবতার সুপ্রকাশ, বিশ্বাস, একত্ববাদ এবং নৈতিকতা। ইসলামী বিপ্লব এই সকল মূল্যবোধ, নীতিমালা ও সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামী সংস্কৃতি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার প্রয়াস পায়। মানুষ এবং এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এর মাধ্যমে ভয়-ভীতি অপসারিত হয়ে মানুষের মনে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মানুষের আত্ম, মন এবং জীবনের পরিশুদ্ধিতে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা ব্যাপক। এর মাঝে ধ্বনিত হয় আশার বাণী। এই সংস্কৃতি জাতিসমূহের ওপর চাপিয়ে দেয়া হীনমন্যতা অপসারণে বদ্ধপরিকর। মানুষের সত্যিকারের ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরে ভক্তিশ্রদ্ধা, আত্মোৎসর্গ, স্নেহ-মমতা এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগ্রত করে। যার ফলে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মানুষ সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ পায়।

মোট কথা ইসলামী সংস্কৃতি মানব জীবনের সকল দিকের ওপর আলোকপাত করে। এই সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। গ্রন্থাগারগুলো জ্ঞান সাধকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবে। লেখকরা সৃষ্টিশীল লেখায় এগিয়ে আসবে। তরুণ প্রজন্ম তাকওয়ার পরিপূর্ণ একটি নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবে। সমাজে তারা যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন হয়ে দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যে তারা মূল্যবান অবদান রাখবে। প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে জ্ঞানচর্চার পরিধি বৃদ্ধি পাবে। তখন এই কিংবদন্তীর অপনোদন হবে যে, 'প্রাচ্যের লোকেরা বই পড়ে না।

এমনকি ইসলামী সংস্কৃতি পরিচালিত সমাজে নারীদের মর্যাদাও সমুন্নত হবে। লেখাপড়া শিখে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার নিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারাও এগিয়ে আসবে।

ইসলামে নারীর অধিকার

ইবরাহীম আমিনী

ইসলাম ধর্ম অনুসারে নারী ও পুরুষ একই মর্যাদার অধিকারী। কারণ, তারা উভয়েই মানুষ। কুরআন মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফাতুল্লাহ) হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে মহান হিসেবে বর্ণনা করেছে–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

নিঃসন্দেহে আমরা আদম-সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং স্থল ও সমুদ্রে (বাহনসমূহে) আরোহণ করিয়েছি এবং তাদের পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে জীবিকা দান করেছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।- সূরা ইসরা : ৭০

উপরন্তু, এটি বর্ণনা করেছে যে, আদম (আ.)-এর এমন উঁচু স্তর রয়েছে যে, ফেরেশতারা তাঁর সামনে অবনত হয়েছিলেন–

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾

যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার থেকে রুহ ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও।'- সূরা হিজ্‌র ১৫ : ২৯

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ

إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

এবং তিনি আদমকে সমুদয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'যদি তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এ সমুদয় নাম বলে দাও।' তারা (অপারগতার সাথে) বলল, আপনি সকল দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ভিন্ন আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম! তুমি তাদের (ফেরেশতাদের) সেগুলোর নাম সম্পর্কে জানাও।' যখন সে তাদের সেগুলোর নাম সম্পর্কে জানাল, তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য সম্বন্ধে অবহিত এবং যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা গোপন করতে, আমি তা জানি।- সূরা বাকারা : ৩১-৩৩

যে কারণে আদম (আ.) নামসমূহকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন তা হলো মানুষ হিসেবে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য (জেনেসিস) এবং পুরুষ ও নারী এক্ষেত্রে সমান। সাধারণভাবে কুরআন ও হাদিসের বর্ণিত সকল প্রশংসা মানব জাতি সম্পর্কিত পুরুষ ও নারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। পবিত্র কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যা নারীকে নারী হওয়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছে।

তাই ইসলাম ও কুরআন অনুযায়ী পুরুষ ও নারী সমানভাবে মানুষ, তাদের মূল্যের কোন পার্থক্য নেই এবং সমাজে তাদের উভয়েরই একই রকম দায়িত্ব রয়েছে, যেগুলো কয়েকটি হলো–

নারী ও পুরুষের সাধারণ দায়িত্ব

১. মানবসন্তানের জন্মদানও মানব প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমানভাবে দায়িত্বশীল। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

হে মানবজাতি! আমরা তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্র (হিসেবে বিভক্ত) করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক সাবধানী (আত্মসংযমী); নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাতা।- সূরা হুজুরাত : ১৩

এটি আরো বর্ণনা করেছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে এক সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জোড়াকেও তার (অনুরূপ বস্তু) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং (কেবল) তাদের উভয়ের থেকে বহু নর ও নারী পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন; এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যার নাম সহযোগে পরস্পর যাঞ্চা কর, আর আত্মীয়তার (সম্পর্কের বিচ্ছেদের) ক্ষেত্রেও (ভয় কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের (কর্মের) পর্যবেক্ষক।- সূরা নিসা : ১

এই আয়াতসমূহে নারী ও পুরুষকে সমাজের দুটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছে, উরন্তু ধার্মিকতাকে পুরুষ ও নারীর শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২. কুরআন আল্লাহয় বিশ্বাস, নৈতিক উন্নতি, সকল অপকর্ম থেকে পরিশুদ্ধি (তাযকিয়া), ধার্মিকতা এবং সৎকর্ম সম্পাদনকে মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ প্রসঙ্গে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করে নি।

প্রকৃতপক্ষে, এটি আধ্যাত্মিক অগ্রগতি, পূর্ণতা এবং আল্লাহর নৈকট্যকে সমভাবে মূল্যবান মনে করে। পরাক্রমশালী আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন–

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

নর হোক অথবা নারী– যে কেউ সৎকর্ম করে এবং সে বিশ্বাসী হয়, আমরা তাকে পবিত্র (অনাবিল) জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যে উত্তম কর্ম সম্পাদন করত তদনুযায়ী প্রতিদান দেব।-সূরা নাহল : ৯৭

আল্লাহ আরো ঘোষণা করেন–

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের প্রার্থনা কবুল করলেন (আর বললেন), 'আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মীর কোন কর্মকে বিনষ্ট করি না- তা সে পুরুষ হোক বা নারী'; তোমরা একে অপর হতে। যারা (আমার জন্য) স্বদেশ ত্যাগ করেছে ও তাদের গৃহসমূহ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, আমার পথে নিগৃহীত হয়েছে এবং যুদ্ধ (জিহাদ) করেছে ও নিহত (শহীদ) হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের থেকে তাদের মন্দ কর্মসমূহকে দূরীভূত করব এবং আমি অবশ্যই তাদের (বেহেশতের) সেই উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; আল্লাহর নিকট থেকে এ তাদের (কৃতকর্মের) পুরস্কার। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম পুরস্কার।-সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

কুরআন সৎকর্মশীল নারী ও পুরুষকে প্রশংসা করেছে এবং নারী-পুরুষকে একইভাবে মূল্যায়ন করে এবং ঘোষণা করে–

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তারা না কোন অভিভাবক পাবে, আর না কোন সাহায্যকারী।-সূরা আহযাব : ৬৫

কুরআন ইতিহাসের গুণসম্পন্ন নারীকে উল্লেখ করেছে, যেমনভাবে এমন পুরুষকে উল্লেখ করেছে এবং তাদের মহানভাবে মন্তব্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত মারইয়াম সম্পর্কে কুরআন বলছে–

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡقًا ۖ قَالَ يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

তখন তার প্রতিপালক তাকে (মারইয়াম) উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম পন্থায় লালন (পালনের বন্দোবস্ত) করলেন, আর যাকারিয়াকে তার অভিভাবক করলেন। যখনই যাকারিয়া তার কাছে (তার) উপাসনাগারে যেত তখন তার কাছে কোন না কোন খাদ্য বিদ্যমান পেত এবং জিজ্ঞেস করত, 'হে মারইয়াম! এ (খাদ্য) তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে?' সে (মারইয়াম) বলত, 'এ আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে।' নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত জীবিকা প্রদান করেন।-সূরা আলে ইমরান : ৩৭

উপরন্তু এটি ঘোষণা করে–

وَإِذۡ قَالَتِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرۡيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصۡطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾

এবং (সে সময়কেও স্মরণ কর) যখন ফেরেশতাগণ মারইয়ামকে বলল, 'হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাকে (যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে) পবিত্র করেছেন এবং নিখিল বিশ্বের নারীদের ওপর তোমাকে মনোনীত করেছেন।'- সূরা আলে ইমরান : ৪২

আসিয়া– ফিরআউনের স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١

আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য ফিরআউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন, যে বলেছিল (প্রার্থনা করেছিল), 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফিরআউন ও তার ক্রিয়াকলাপ হতে উদ্ধার কর এবং অবিচারক সম্প্রদায় হতে আমাকে মুক্তি দান কর।'- সূরা তাহরীম : ১১

পুণ্যবতী ফাতিমা, নবীকরিম (সা.)-এর কন্যা এই সকল নারীর অন্যতম। আয়াতে তাতহীর (পবিত্রতার আয়াত) ফাতিমা সম্পর্কে, তাঁর স্বামী, তাঁর পিতা এবং তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে। প্রশংসিত আল্লাহ বলেন–

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣

এবং তোমাদের গৃহে অবস্থান করবে, পূর্বের জাহেলি যুগের ন্যায় নিজেদের সজ্জিত করে প্রদর্শন করে বেড়িও না; এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে। আল্লাহ কেবল চান যে, হে আহলে বাইত! তোমাদের হতে সর্ব প্রকারের কলুষ দূরে রাখতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে।- সূরা আহযাব : ৩৩

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এই সকল নারী সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, ' বেহেশতের মহান নারীরা চারজন– মারইয়াম– ইমরানের কন্যা, ফাতিমা– মুহাম্মাদের কন্যা, খাদিজা– খুওয়াইলিদের কন্যা, আসিয়া– মুযাহিমের কন্যা, ফিরআউনের স্ত্রী।– কাশফুল গাম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কুরআন নারী হওয়াকে অগ্রগতি, উন্নতি এবং মানবীয় পূর্ণতা অর্জনের প্রতিবন্ধক বিবেচনা করে নি; বরং এটি নারীকে পূর্ণতা অর্জনে পুরুষের মতোই যোগ্যতাসম্পন্ন/গুণসম্পন্ন মনে করে।

অবশ্য পবিত্র কুরআনে কতিপয় নারীকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, যেমন নূহ (আ.)-এর স্ত্রী, লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং মূর্তিপূজক আবু লাহাবের স্ত্রী। একইভাবে অনেক পুরুষ তাদের অপকর্মের জন্য তিরস্কৃত হয়েছে, যেমন ফিরআউন, নমরুদ এবং আবু লাহাব।

৩. ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমাজের– দুটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে যাদের একটি অভিন্ন ভূমিকা রয়েছে সমাজের ....., গঠন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং সকল দিক থেকে সম অংশীদারিত্ব রয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়েই সমাজের অংশ এবং ন্যায়পরায়ণ সমাজের উত্তম কাজ দ্বারা একত্রে লাভবান হয় এবং এর দুর্নীতির ধ্বংসাত্মক প্রভাব দ্বারা ভুক্তভোগী হয়। ফলাফল, পরিশেষে ব্যবস্থাপনাকে সংশোধন করা এবং সমাজের পুনর্গঠন নারী পুরুষের উভয়ের দায়িত্ব, মহান আল্লাহ বলেন,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীরা একে অপরের বন্ধু; তারা সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং অসৎকর্ম হতে নিবৃত্ত করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা সেসব লোক যাদের আল্লাহ অনতিবিলম্বে করুণা করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।- সূরা তওবা : ৭১

এটি সত্য যে, জিহাদে অংশগ্রহণ ও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) নয়। কিন্তু তাদেরকে সমাজের অন্য কোন দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়া হয় নি : সৎকাজে আদেশ (আম্‌র বিল মারুফ) এবং অসৎকাজে নিষেধ (নাহি আনিল মুনকার), ধর্ম ও এর পবিত্রতা সংরক্ষণ, ইসলামের প্রচার, সহিংসতা ও সীমালঙ্ঘন

এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বঞ্চিত ও অত্যাচারিতদের অধিকারের প্রতিরক্ষা, ভালো কাজে সহযোগিতা, অসহায় ও দুর্গতকে সাহায্য; অসুস্থ, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সেবা, সামাজিক দুর্নীতি ও অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা, যুবকদের যথাযথ প্রতিপালন, জ্ঞান বিতরণ বৃদ্ধি, ইসলামের ন্যায়পরায়ণ শাসনেক প্রতিরক্ষা করা, ইসলামি মূল্যবোধকে সমুন্নত করা, পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করায় অংশগ্রহণ/অবদান এবং আরো অনেক অভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে নারী ও পুরুষের কাঁধে।

৪. নারী ও পুরুষের অন্যান্য অভিন্ন দায়িত্ব হলো জ্ঞান অর্জন করা এবং ..... কসমসের রহস্য উদ্ঘাটন করা এবং সেগুলো ব্যবহার করা জনকল্যাণ বৃদ্ধি করার জন্য। ..... নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ এবং সেহেতু এই বিষয়ে দায়িত্বশীল ও সক্ষম।

ইসলাম জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এমনকি একে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। ইমাম সাদিক (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন– 'জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরয। জেনে রাখ, আল্লাহ জ্ঞানের অন্বেষণকারীকে সত্যিই ভালোবাসেন।'– কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০

ইমাম বাকের (আ.) বলেছেন, 'একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যে তার জ্ঞানকে ব্যবহার করে, সে সত্তর হাজার আবেদ অপেক্ষা উত্তম।'– কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩

এ বিষয়ে একই রকম শত শত হাদিস রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুসলিম হিসেবে নারীকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে ঐসব বিজ্ঞানের জ্ঞান যা প্রয়োজনীয়– থেরাপি, দাঁত, মনস্তত্ত্ব, ফার্মেসী, নার্সিং, প্রসূতিবিদ্যা, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ইসলামি বিজ্ঞান, তাফসীর, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় আইন, ইতিহাস, সাহিত্য, কলা, ভাষাতত্ত্ব, ভাষা, আইন, অর্থনীতি ইত্যাদি।

সমাজের অর্ধেক নারী, সুতরাং এর প্রশাসনে তাদের অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। এই কারণে প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ এসব ক্ষেত্রে পুরুষ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সমান হতে হবে তাদেরকে হাসপাতাল, ক্লিনিক, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, অ্যাকাডেমি, ফার্মেসী, ল্যাবরেটরি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

এবং ইসলামি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীদের জন্য অর্ধেক বরাদ্দ করতে হবে। উপরন্তু সকল মাতৃসদন, নারীদের জন্য বিশেষভাবে থাকবে, আর ততজন পুরুষ বিশেষজ্ঞ থাকবে যতজন পুরুষ রোগীর জন্য প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এমনটি নয়। এটি ত্রুটি অথবা বৈসাদৃশ্য হয়তো নিম্নলিখিত দুটি কারণে–

ক. স্বার্থপরতা, আত্মঅহমিকা এবং ইতিহাসজুড়ে পুরুষের অবিচার, নারীদেরকে তাদের স্বাধীন হবার আইনগত অধিকার অর্জন হতে বিরত রেখেছে এবং নারীকে নির্ভরশীল করে রেখেছে।

খ. নিজেকে অবহেলা করা, নিজ সম্পর্কে–

নারীকে অবশ্যই তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে অনুধাবন করায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং অন্য অনেক বিপথগামীর মতো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

নারী ও স্বাধীনতা

পুরুষের মতো নারীও স্বাধীন রূপে সৃষ্ট হয়েছে এবং অন্যদের প্ররোচনা ... ছাড়া বাঁচার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতার প্রতি অনুরক্তি একটি স্বাভাবিক ও আইনগত আকাঙ্ক্ষা। যাহোক, মানুষ কি সত্যিই স্বাধীনভাবে এবং কারো সহযোগিতা ছাড়া সমাজে জীবন যাপন করতে পারে? মানুষের তাদের সহযোগী সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই অন্যদের অধিকার ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং নিজেদের ব্যক্তিক স্বাধীনতার সীমা সামাজিক আইনের আওতায় থাকতে হবে। এই সীমাবদ্ধতাগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়; এগুলো মানবতার জন্য কল্যাণকর। উপরন্তু পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা এবং কারো জবাবদিহিতাহীন ইন্দ্রিয় বাসনা চরিতার্থ করা মানবতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরকম ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আরোপ করতে হবে যেহেতু এটি সকলের জন্য সত্যিকারভাবে কল্যাণকর।

যদিও ইসলাম মানুষের স্বাধীনতাকে সম্মান করে, তথাপি এটি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে সম্ভব এবং মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক কল্যাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গণ্য করে

না। সুতরাং আধ্যাত্মিক, বস্তুগত, পার্থিব, অন্য জাগতিক, ব্যক্তিক এবং মানুষের সামাজিক উপকার বিবেচনায় ইসলাম অধ্যাদেশ, আইন ও দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছে। কিছু কিছু সীমাবদ্ধকারী নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞা কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে হয়তো সন্তুষ্ট নাও করতে পারে এবং তারা এগুলো তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক রূপে গণ্য করতে পারে। যাহোক, এ ধরনের মূল্যায়ন হলো কারো নিজের সত্যিকার লাভের ব্যাপারে সঠিক বুঝের ঘাটতির ফলাফল। যদি মানুষ তার লাভের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সচেতন হয় তাহলে তারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে তাদের স্বাধীনতার বিপরীত ক্ষতি মনে করে না এবং স্বেচ্ছায় এসব সীমাবদ্ধতাকে সম্মতি দেবে। নারীর স্বাধীনতা এমনই একটি বিষয়। ইসলাম নারীর স্বাধীনতাকে সম্মান করে।

এটি ব্যতীত যে, সমগ্র মানবসমাজের সত্যিকার লাভের বিপরীত না হয়। সুতরাং ক্ষেত্র বিশেষে নারীর সত্যিকার লাভের সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

১. কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা

যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, ইসলাম নারীকে সমাজের দুটি স্তম্ভের একটি মনে করে এবং তাদের ওপর নানা দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নারী সমাজের ক্রিপল্ড অথবা অব্যবহৃত হতে পারে না এবং তা উচিতও নয়। ইসলাম কাজ করাকে ফরয কর্ম বলে মনে করে এবং ইবাদতের ঊর্ধ্বতন এবং এর সমর্থকদেরকে অলসতা, সৌখিন্য এবং কাজ থেকে অবসর গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক করে। এই বিষয়ে অনেক হাদিস রয়েছে যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : ইবাদতের সত্তরটি অংশ আছে : তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলে বৈধ আয়ের জন্য আত্মনিয়োগ করা।– কাফী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৮

ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.) বলেন, নিশ্চয়ই সম্মানিত আল্লাহ অলস বান্দাকে অপছন্দ করেন।- কাফী, পৃ. ৮৪

ইসলাম অনুযায়ী কাজ করা অধিকার নয়; বরং কর্তব্য এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে এ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। নারীকেও তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তারা তাদের পেশা পছন্দ করার ব্যাপারে স্বাধীন। নারীর বিশেষ শারীরিক ও

আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য চিন্তা করলে বোঝা যায়, সকল ধরনের কাজ তাদের বিশিষ্টতা অথবা সক্ষমতা এবং সমাজের অন্য সদস্যদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নারী হলো এক্সকুইসিট, সংবেদনশীল এবং সুন্দর সৃষ্টি। এই এক্সকুইসিটনেস এবং সৌন্দর্যের কারণে তাদের পুরুষের সাথে এলুর .... ও প্রভাব আছে। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই এমন কোন পেশা বেছে নিতে হবে যা তাদের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সৌন্দর্যের এমপিকেবল... তাদের স্বামীদের জন্য বজায় রাখতে পারে। সুতরাং কষ্টসাধ্য এবং শারীরিক কষ্টসাধ্য পেশা নারীর জন্য এডভাইজ করা যায় না; এই পেশাগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারী যানবাহন চালনা, রাত জেগে কাজ করা, কৃষিকাজ, পশুপালন, খনিতে কাজ করা, লোহার কাজ, সিমেন্ট ও অটোমোবাইল কারখানার কাজ ইত্যাদি। এসব কাজ সাধারণভাবে একজন নারীর শারীরিক সক্ষমতার বাইরে এবং তাদের সৌন্দর্য এক্স, এবং এলুকে হুমকির সম্মুখীন করে– যা নারীর জন্য উপকারী নয়, আর তার সঙ্গীর জন্যও নয়।

পরিশেষে, ইসলাম উপদেশ দেয় যে, পুরুষের উচিত নয় যে, নারীকে মজুরের কাজ করার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করে।। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাঁর সন্তান ইমাম হাসান (আ.)- কে বলেন : নারী তার সাধ্যের বাইরে কাজ করুক তা মেনে নিও না, কারণ, এটি তাদের মর্যাদার উপযোগী; এটি তাদের অন্তরকে শান্ত করে এবং তাদের সৌন্দর্যকে সংরক্ষণ করে; নিশ্চয়ই নারী হলো সুগন্ধি ফুলের মতো এবং সে যোদ্ধা নয়।'– ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৬৪

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, নারী অপরূপ সুন্দর, সৌন্দর্য এবং মনোমুগ্ধকর অধিকাংশ পুরুষের যৌন কামনা প্রতিরোধের ব্যাপারে অক্ষমতার মতোই স্বাভাবিক। তাই নারীর স্বার্থেই বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে সমাজের স্বার্থেই তারা সেসব পেশা নির্বাচন করে যেখানে দয়ামায়াহীন লোকদের, বিশেষ করে যুবক ও অবিবাহিত মানুষদের সংস্পর্শে কম আসতে হয়– তাদের বিশ্বাস ও সুনামের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিকে এড়ানোর লক্ষ্যে এবং সমাজের স্বাস্থ্য ও পুণ্যে সহায়তা করার জন্য।

আমাদের চিন্তায় এটাও থাকা অবশ্যই দরকার যে, নারী হলো আবেগপ্রবণ এবং স্নেহপরায়ণ এবং পুরুষের তুলনায় তারা দ্রুত তাদের আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এটি নারীর জন্য অথবা সমাজের জন্য উপকারী নয় যে, তারা এমন পেশা গ্রহণ করবে যেখানে প্রতিনিয়ত ফয়সালাকারী সিদ্ধান্ত নিতে হয় অথবা

কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়– যেমন, বিচারকার্য এবং সামরিক এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ পেশা।

সর্বশেষ যে বিষয়টি কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে নারীকে মনে রাখতে হবে তা হলো তার সন্তান-সন্ততিদের অধিকারের দিকে নজর রাখা এবং পরিবারের সংরক্ষণ।

যদি একজন নারী বিবাহিতা হয় এবং সন্তান থাকে, তাকে অবশ্যই এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে যে, তার বরং অপেক্ষাকৃত বড় দায়িত্ব রয়ে গেছে, তা হলো স্বামীর সেবা করা এবং সঠিকভাবে তার সন্তানদের পরিচর্যা করা; একটি দায়িত্ব যা নারীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য– তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এটি সত্য যে, নারীরা তাদের পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীন, কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই এমন একটি কাজ বেছে নিতে হবে যা তাদের পরিবারের ভিত্তিকে দুর্বল করে না এবং যা সন্তানদেরকে মাতৃস্নেহ ও ভালোবাসা এবং সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত করবে না এবং এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হবে এবং পুরুষকে অবশ্যই তাদের অযথাযথ রায়, স্বার্থপরতা, আত্মঅহমিকা এবং পিতৃতান্ত্রিক রীতি পরিহার করতে হবে এবং অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে পরিবারে স্বার্থের বিষয়টি অনুপাতে নারীকে উপযোগী ক্যারিয়ার বেছে নেয়ার অনুমতি দেবে।

২. মালিকানার ক্ষেত্রে অধিকার

ইসলাম নারী ও পুরুষের মালিকানাকে সম্মান করে। একজন নারী অর্জন করতে পারে এবং সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক হতে পারে শিক্ষা, বাণিজ্য, যৌতুক, উপহার, স্টাফ হিসেবে কাজ করে অথবা অন্য কোন বৈধ পথে। সে এগুলো থেকে লাভ অর্জন করতে পারে এবং তার অনুমতি ছাড়া অন্য কারো তার সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের অধিকার নেই, সে হতে পারে তার পিতা-মাতা, স্বামী অথবা সন্তান। কুরআন ঘোষণা করছে :

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

এবং আল্লাহ যে কারণে তোমাদের একজনকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষা কর না; পুরুষদের জন্য সেই অংশ যা তারা অর্জন করেছে এবং নারীদের জন্য সেই অংশ যা তারা লাভ করেছে; এবং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কামনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।- সূরা নিসা : ৩২

৩. বিবাহের ক্ষেত্রে অধিকার

পুরুষের মতো নারীও বিবাহের ক্ষেত্রে এবং তার জীবনসঙ্গী বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন। একজন সাবালিকা/প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যায় না এবং এধরনের বিয়ে বাতিল। কারো অধিকার নেই একজন নারীকে জোর করে বিয়ে করার অথবা তার জন্য একজন স্বামী নির্বাচন করার, এমনকি তার পিতা, মাতা, সহোদর অথবা দাদা-দাদীর। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন,

নারীদেরকে বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই সম্মতি নিতে হবে– কুমারী অথবা অন্য কেউ এবং নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে সঠিক নয়। –ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২৮৪

এক ব্যক্তি যে তাঁর বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : অবশ্যই তার সম্মতি চাইতে হবে। যদি সে নীরব থাকে তাহলে তার নীরবতাই সম্মতি, আর নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে সঠিক নয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

সুতরাং একটি বিয়ে সঠিক হওয়ার জন্য নারীর সম্মতি প্রয়োজন– সে কুমারী হোক অথবা অকুমারী। এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায় যে, একটি বিয়ে সঠিক হওয়ার জন্য নারীর সম্মতি ছাড়াও তার পিতা অথবা দাদার সম্মতির প্রয়োজন আছে কিনা?

এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া যায়– এক্সপাউন্ডেড

যদি সেই নারী কুমারী না হয় (আগে বিয়ে করেছিল) তাহলে তার পিতা বা দাদার সম্মতির প্রয়োজন নেই এবং সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিভিন্ন হাদিসে এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অকুমারী নারীর বিয়ের ব্যাপারে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : তার নিজের ওপর অন্য সকলের চেয়ে তার অধিক কর্তৃত্ব রয়েছে। যদি তার আগে বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে সে কাঙ্ক্ষিত জীবনসঙ্গীকে বিয়ে করতে পারে, যদি সে তার জন্য উত্তম হয়।– ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৭

ইমাম সাদিক (আ.) আরো বলেন, একজন অকুমারী (যার আগে বিয়ে হয়েছে) নারীর জন্য পিতার সম্মতি ছাড়া বিয়েতে কোন সমস্যা নেই যদি তার কোন খুঁত না থাকে। পৃ. ২৭২

কিন্তু যদি একজন নারী কুমারী হয় (পূর্বে বিয়ে না হয়) তাহলে প্রায় সকল ফকীহ তার পিতা অথবা দাদার সম্মতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং অনেক হাদিস দ্বারা এই দাবিকে প্রমাণ করেছেন। ইমাম সাদিক (আ.) ঘোষণা করেন :

একজন কুমারী যার পিতা রয়েছে, অবশ্যই তার পিতার সম্মতি ছাড়া বিয়ে করবে না।– পৃ. ২৭০

একজন কুমারী নারীর স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার পিতা বা দাদার সম্মতির ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তারপরও এই সীমাবদ্ধতা কেবল সেই নারীর জন্য ক্ষতিকর নয়, এমন নয়; বরং প্রাথমিকভাবে এটি তার ভালোর জন্যই। কারণ, কুমারী নারী আগে বিয়ে করে নি, এ ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাদের ভদ্রতার জন্য তার জন্য উপযোগী ব্যক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন একজন সহানুভূতিশীল, স্নেহপরায়ণ এবং অভিজ্ঞ উপদেশদাতার যে তাকে নির্দেশনা দিতে পারে। আর একজন পিতা বা দাদা এই গুরুত্বপূর্ণ ও ভাগ্যনির্ধারণী বিষয়ে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।

পিতার সাথে আলোচনা করা ও পিতার সম্মতির অতিরিক্ত সুবিধাও রয়েছে। পিতার অনুমোদন ও তার সাথে সহযোগিতা পিতার প্রতি এক ধরনের সম্মান প্রদর্শন। নিঃসন্দেহে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বিবাহিত দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন এবং সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

এখানে এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, এই নিয়মের দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে– প্রথমত যখন এই নারীর পিতা বা দাদার সম্মতি নেয়ার সুযোগ নেই, দ্বিতীয়ত যখন নারীর বিয়ে করার প্রয়োজন এবং তার উপযোগী পাত্র রয়েছে, কিন্তু তার পিতা অগ্রহণযোগ অজুহাত দেখায় এবং প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করে। এই দুটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় ফকিহ তার পিতার পরিবর্তে তাকে তার কাঙ্ক্ষিত ও যোগ্য পাত্রকে বিয়ে করার অনুমতি দিতে পারে।

৪. জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা

অবিবাহিত নারী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং কারো অধিকার নেই তাকে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করবে। অন্যদিকে একজন বিবাহিত নারী অবশ্যই তার স্বামী ও সন্তানের অধিকারের বিষয়টি খেয়াল রাখবে এবং এই বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে আলোচনা করবে। এই বিষয়ের শর্তগুলো নারীর কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত শর্তগুলোর মতোই।

অবশ্যই এটি ঘরের বাইরে শিক্ষাগত সুবিধাসমূহ, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সাথে সম্পৃক্ত; ঘরের মধ্যে অবসর সময়ে অধ্যয়ন পারিবারিক জীবনকে ব্যাহত করে না।

৫. বসবাসের স্থান নির্বাচনের স্বাধীনতা

অবিবাহিত নারী তার বসবাসের জন্য বাড়ি নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাধীন, যদিও বিবাহিত নারী স্বামীর বসবাসের স্থানে থাকতে বাধ্য। বাড়ির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পুরুষের এবং এটি তাদের বিশেষ অধিকার। সাধারণভাবে বাড়িটি হতে হবে পরিবারের মর্যাদা অনুযায়ী, স্বামীর পুঁজির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যাতে পরিবারের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়। যদি তারা একটি বাসা অন্যের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বসবাস করে (অন্য আত্মীয়ের সাথে) আর যদি নারী পৃথক বাসা নেয়ার জন্য অনুরোধ করে, যদি পুরুষের ক্ষমতা থাকে তাহলে সে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করবে। উপরন্তু যদি তাদের বাড়ি ছোট হয় অথবা যদি তারা চাপে থাকে কোন কারণে এবং যদি নারী নতুন বাড়ি চায় তাহলে পুরুষের যদি সক্ষমতা থাকে, তাহলে সে অবশ্যই তা মেনে নেবে। এগুলো হলো সদয় সহযোগিতা যা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পক্ষে বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাও এবং (দেনমোহর হিসেবে) যা কিছু তাদের অর্পণ করেছ তা হতে কিছু ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ কর; তবে হ্যাঁ, যখন সে প্রকাশ্যে কোন অশ্লীল কাজ করবে; এবং তাদের সাথে সদাচার করতে থাক। আর যদি তুমি কোন কারণে তাকে অপছন্দও করে থাক, তাই (দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না। কারণ,) হয়ত কোন জিনিস তুমি অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ তোমার জন্য তাতে অত্যধিক কল্যাণ রেখেছেন।- সূরা নিসা : ১৯

কুরআনে এও বলা হয়েছে–

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে তোমরা বসবাস কর তাদেরও সেরূপ গৃহে বাস করতে দিও; তাদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপের উদ্দেশ্যে তাদের নির্যাতন কর না, তারা যদি গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে; যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং (পারিশ্রমিকের বিষয়টি) পরস্পরের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে স্থির করবে ; কিন্তু যদি তোমরা উভয়ে অসুবিধায় পড় তবে অচিরেই অন্য কেউ (নারী) তাকে স্তন্যদান করবে।- সূরা তালাক : ৬

যদিও বাড়ি নির্বাচন পুরুষের বিশেষ অধিকার, নারী তার বিয়ের চুক্তিতে একটি ধারা যোগ করতে পারে যে, সে বসবাসের জায়গা নির্বাচন করার অথবা অনুরোধ করতে পারবে যে, তাকে বসবাসের অধিকার দিতে হবে। যদি সেই পুরুষ এই শর্ত মেনে নেয় তাহলে তাকে অবশ্যই এই ব্যাপারে স্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে এবং সে যদি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে একজন অপরাধী বা পাপী।

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

ইমাম আলী (আ.) এর কতিপয় প্রজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা

সংকলন : এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

১. মানবীয় গুণের অধিকারী ব্যক্তির ত্রুটি উপেক্ষা বাঞ্ছনীয়

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন, 'মানবীয় গুণের অধিকারী ব্যক্তির (বুদ্ধিমান, বিবেচক ও পুরুষোচিত গুণ বিশিষ্ট) দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবে, কারণ তাদের মধ্যে কেউ ভ্রমে পতিত হলেও আল্লাহর হাত তার হাতে রয়েছে এবং তিনি তাকে উঠিয়ে আনেন।'

ব্যাখ্যা

ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর শারহু নাহজিল বালাগা গ্রন্থে 'মুরুওয়্যাত' (مُروت) শব্দটির অর্থ করেছেন 'মানবীয় ও পুরুষোচিত গুণ' এবং বলেছেন পৌরুষ (কাপুরুষতার বিপরীত অর্থ) সম্পর্কে একটি মারফু রেওয়ায়াতের সুত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন: ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হতে চাইলে পৌরুষকে ত্যাগ করতে হয়; ভোগ-বিলাস ত্যাগের মধ্যেই পৌরুষ রয়েছে।

অপর এক হাদীসে এসেছে যে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ্র রাসুল! আমি কি আমার গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই? তিনি বললেন: তোমার মধ্যে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে তুমি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তোমার মধ্যে যদি পছন্দনীয় নৈতিক গুণাবলী থাকে তবে তুমি পৌরুষ ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যদি তোমার সম্পদ থাকে তাহলে তুমি তাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি, আর যদি তোমার মধ্যে সংযম ও খোদাভীতি থাকে তবে তুমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি।

ইবনে মাইসাম বলেন: যেহেতু উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি বিবেচক হয়ে থাকে সেহেতু তারা কদাচিত ভ্রমে পতিত হয়। এরূপ নৈতিক গুণের অধিকারী ব্যক্তি সৃষ্টিকে (মানুষের হৃদয়কে) নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তাদের সহযোগিতার হাত তার জন্য উন্মুক্ত থাকে। ফলে মানুষ তার ক্ষুদ্র দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। উপরোক্ত বাণীতে আল্লাহ্‌র হাত বলতে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও অসীম ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. আল্লাহই সাহায্যহীনদের সাহায্যকারী

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন, 'যাকে আপনজনে পরিত্যাগ করে, পরজন তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।'

ব্যাখ্যা

ইবনে মাইসাম তার 'শারহু নাহজিল বালাগা' গ্রন্থে এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন: মহান আল্লাহ্‌ প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণ করেছেন যার সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি এবং বাঁচার মাধ্যম নিকটজনদের সহযোগিতায় সংগ্রহ হয়। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য এটি একমাত্র মাধ্যম বলে বিবেচনা করা ঠিক নয়। তাই যদি কখনো নিকটাত্মীয় ও বন্ধুজন কাউকে পার্থিব প্রয়োজন মিটান থেকে বিরত থাকে ও তার অধিকার খর্ব করে, তখন আল্লাহ্‌ তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যারা তার পর এবং যাদের থেকে সে সহযোগিতার আশা করেনি তাদের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করেন।

৩. নেতা ও পথপ্রদর্শক হওয়ার আবশ্যক শর্ত

ইমাম আলী (আ.) বলেন ,'যে নিজেকে মানুষের নেতা হিসেবে নিয়োজিত করতে চায় তার উচিত অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নিজে শিক্ষা গ্রহণ করা, তার জিহবা দিয়ে (মৌখিকভাবে) তাদেরকে সদাচরণ শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে যেন নিজের ব্যবহার ও আচরণ দিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি নিজেকে শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সম্মানীয় যে মানুষকে শিষ্টাচার শেখায়।'

ব্যাখ্যা

ইবনে মাইসাম বলেন: যে ব্যক্তি জনগণের নেতা হতে চাইবে তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে আগে নিজেকে গড়ে তোলা, যাতে তার জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর সমঞ্জস হয়। কারণ মানুষ কাউকে অনুসরণের ক্ষেত্রে তার কর্ম, চরিত্র ও আচরণের দিকে লক্ষ্য করে। শুধু তার কথার ওপর তারা নির্ভর করে না। তাই বিশেষভাবে যখন তারা কোন নেতার কথা ও কর্মের মধ্যে গরমিল দেখে তখন তারা কর্মের পরিপন্থী কথার প্রতি সন্দিহান হয় ও তাদের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় তারা সমাজে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ মতের বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখায়।

ইমাম আলী (আ.) এখানে উত্তম আচরণ ও ব্যবহার এবং প্রশংসনীয় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মানুষের স্বভাব হচ্ছে সে অন্যের কথা অপেক্ষা কর্মকেই আগে বিচার করে ও তার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়। অতঃপর কর্মকে তার কথার সাথে মিলিয়ে দেখে। একারণে হযরত আলী (আ.) আগে আত্মগঠনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আসলে আত্মগঠনে ব্রতী হওয়াই মূল কাজ। তাই তা আগে প্রয়োজন। কিন্তু অপরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও পরিচালনা করা হচ্ছে গৌণ, তাই তা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের কর্ম ও আচরণকে সংশোধনের মাধ্যমে আত্মগঠনের প্রচেষ্টায় রত হয়েছে সে অধিকতর সম্মানের উপযুক্ত।

ইবনে আবিল হাদীদ একটি উপমার সাহায্যে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। উপমাটি হচ্ছে: একটি শাখা তার মূল থেকে পুষ্টি লাভ করে। তাই শাখার সঠিক বিকাশ মূলের ওপর নির্ভর করে। যদি কোন বস্তু নিজেই বাঁকা হয় তার ছায়াও বাঁকা হবে। এমন সম্ভব নয় যে, মূল বাঁকা হবে অথচ তার শাখা সরল ও সোজা হবে। তাই যে ব্যক্তি অন্য লোকদের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে তার উচিত আগে নিজের কর্ম ও আচরণকে পরিশুদ্ধ করা এবং সেজন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। আর সে যেহেতু আত্মগঠনের পর অন্যদের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার কাজে নিয়োজিত হয় কাজেই তার সম্মান নিষ্কর্মা ও অপরিশুদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি।

৪. ইমাম আলী (আ.)-এর প্রকৃত ভালবাসা পোষণকারী ব্যক্তির ওপর আপতিত বিপদের মাত্রা

আমিরুল মুমিনীন (আ.) তার অন্যতম প্রিয়ভাজনসাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ আল আনসারীরমৃত্যুতে বলেন, 'যদি পর্বতও আমাকে ভালবাসত তবে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।'

এ বাক্যটি তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর অনুরূপ :

'যারা আমাদেরকে অর্থাৎ আহলে বাইতকে ভালবাসে তাদের দরিদ্রতার (মোকাবিলার) জন্য চাদর প্রস্তুত রাখতে হবে।'

ব্যাখ্যা

প্রথম বাক্যে পর্বত চূর্ণ-বিচুর্ণ হওয়ার অর্থ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। অর্থাৎ তাদের সামনে এত অধিক পরিমাণে বিপদ আপদ নেমে অসে যে তার মোকাবেলায় টিকে থাকা দুষ্কর হয়।

সাইয়েদ শরীফ রাজী বলেন: এ বাণীর অর্থ হল যদি কেউ তাঁকে ভালবাসে তবে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ তার দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। এ অবস্থা শুধু আল্লাহ্‌র মনোনীত সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান বান্দাদের জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আর দ্বিতীয় বাক্যে দরিদ্রতার মোকাবিলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা বোঝাতে চাদর দ্বারা নিজেকে বেষ্টিত করার উপমা দেওয়া হয়েছে। ধৈর্য হচ্ছে দরিদ্রের মোকাবিলায় মানুষকে রক্ষাকারী চাদরস্বরূপ। কারণ দারিদ্রের ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যে দিশেহারা অবস্থা, মনঃকষ্ট, মন্দ স্বভাব ইত্যাদির সৃষ্টি হয় যা তাকে কুফ্‌রের দিকে পরিচালিত করে। এক্ষেত্রে যদি মানুষের মধ্যে চরম ধৈর্য না থাকে তবে সহজেই সে তাতে পতিত হয়। যেহেতু আহলে বাইতের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার দাবী হল সকল ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ, যেমন দারিদ্রকে বরণ, দুনিয়ার প্রতি বিরাগ, বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ ইত্যাদি সেহেতু তাঁদের যে ভালবাসা পোষণ করে, তাকেও সকল ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে অনুসরণ করতে হবে।

ইবনে কুতাইবা হযরত আলী (আ.) থেকে অনুরূপ একটি বাণী বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন: যে আমাদের ভালবাসবে সে যেন দুনিয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে

কমায় এবং অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে। তাঁর দৃষ্টিতে ধৈর্যকে দরিদ্রের জন্য চাদরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ চাদর যেমনভাবে দেহকে ঢেকে রাখে ধৈর্যও তেমনি দারিদ্রকে ঢেকে রাখে। হযরত আলী (আ.)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি এ ব্যাখ্যার সপক্ষে একটি যুক্তিস্বরূপ। বর্ণিত আছে যে, একদল লোক হযরত আলী (আ.) এর সঙ্গে দেখা করতে আসল। তিনি স্বীয় ভৃত্য কাম্বারকে তাদের পরিচয় জানতে বললেন। কাম্বার খোঁজ নিয়ে এসে জানায়: হে আমিরুল মুমিনীন, এরা আপনার শিয়া (অনুসারী)। আলী (আ.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমি তো তাদের মধ্যে শিয়ার (পরিচয়ের) কোন লক্ষণ দেখছি না। সে বলল: শিয়ার লক্ষণ কি? আলী (আ.) বললেন: ক্ষুধার্ত থাকার কারণে তাদের উদর শীর্ণ ও ছোট, তৃষ্ণার্ত থাকার কারণে তাদের ওষ্ঠ শুষ্ক এবং ক্রন্দনের কারণে তাদের চক্ষু সিক্ত।

আবু উবাইদ বলেন: এ বাণীতে হযরত আলী (আ.) ইহলৌকিক দারিদ্রের কথা বলেন নি। কেননা আপনারা সকলেই লক্ষ্য করেন যে, যারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতকে ভালবাসে তাদের অনেকেই সমাজের অন্যান্য মানুষের মত সম্পদশালী। সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্য কিয়ামত দিবসের দারিদ্র। অর্থাৎ তিনি কিয়ামতের দিন যেন তারা নিঃস্ব না হয় তার জন্য তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। এজন্যই তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে চলার উপদেশ দান করেছেন যাতে তারা এ পথ অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়।

সাইয়েদ মুর্তাযা বলেন: উপরিউক্ত দুটি ব্যাখ্যাই সঠিক। তবে প্রথমোক্ত অর্থাৎ ইবনে কুতাইবা প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি যথার্থ ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

৫. আল্লাহ ও আখেরাতের সাথে সম্পর্ক রাখার গুরুত্ব ও সুফল

আলী (আ.) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তার নিজের মধ্যকার সম্পর্ককে সঠিক রাখে (অর্থাৎ এ ব্যাপারে যথাযথ আচরণ করে) তবে আল্লাহ্ তার ও মানুষের মধ্যকার বিষয়াবলীকে ঠিক করে দেন। যদি কেউ তার পরকালের বিষয়ে যথাযথ কাজ করে তবে আল্লাহ্ তার ইহকালের বিষয়সমূহকে যথাযথ রাখেন। যদি কেউ নিজেই নিজের উপদেশ দানকারী হয় তবে আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তার জন্য একজন রক্ষক নিয়োজিত করেন।'

ব্যাখ্যা

ইবনে মাইসাম বলেন: আল্লাহ্ ও ব্যক্তির নিজের মধ্যকার ব্যাপারে যথাযথ আচরণের অর্থ হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য যতটা আত্মসংযমী হওয়া প্রয়োজন ততটা আত্মসংযমী হওয়া। যেমন, নিজের ক্রোধ ও প্রবৃত্তির কামনাকে সংযত রাখা যা সকল পাপের উৎস এবং তাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ যদি কেউ এ বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে তবে আল্লাহ্ তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যকার ব্যাপারে সঠিক সমাধানের পথ সহজ করে দিবেন।

মানুষ তার পরকালের জন্য কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে পালন করার অপরিহার্য দাবি হচ্ছে দুনিয়ার চাকচিক্যে দ্বারা আকৃষ্ট না হওয়া এবং প্রাচুর্যের লালসায় দুনিয়ার সম্পদকে কুক্ষিগত করার চেষ্টায় লিপ্ত না হওয়া। উক্ত ব্যক্তি এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি যখন তার আখেরাতের চিন্তায় অন্যের সাথে লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে তখন তা অন্যদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। ফলে তারাও তার প্রতি সদাচরণ করে এবং তার উপকারের চেষ্টা করে। এমনকি মন্দ ব্যক্তিরাও তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে। এ সকল বিষয় তার দুনিয়ার জীবনকে সহজ করে দেয়। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, সে পৃথিবীতে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করে। বরং এ কথার উদ্দেশ্য হল উক্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জন তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি নিজেই নিজের উপদেশ দাতা হয়, এটা তার জন্য তাকওয়া তথা খোদাভীতি অবলম্বনে সহায়ক হয়। ফলে সে তার প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মানুষের প্রবৃত্তি ও ক্রোধ অসংখ্য কল্যাণের উৎস হলেও যদি তা নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। পক্ষান্তরে যদি এ দুয়ের ওপর মানুষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে সে ঐ ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। সেক্ষেত্রে তা মানুষের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়োজিত রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

৬. প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাখ্যা

এক ব্যক্তি আলী (আ.)-কে কল্যাণ কি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'কল্যাণ (সৌভাগ্য) এটা নয় যে, তোমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়বে। বরং কল্যাণ হল তোমার জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটবে, তোমার ধৈর্য ও সহনশীলতা মহৎ হবে, তোমার প্রভুর ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। যদি তুমি ভাল কাজ কর তবে আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করবে, যদি তুমি মন্দ কাজ কর তবে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ পৃথিবীতে দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য কল্যাণ নেইঃ যে ব্যক্তি পাপ করার পর তওবার মাধ্যমে তার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে এবং যে সৎ কর্মের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। যে কর্মে আল্লাহ্‌র ভীতি থাকে তা কম (বলে গণ্য) হতে পারে না এবং যা তাঁর কাছে গৃহীত হয়েছে তা কখনই অল্প নয়।

ব্যাখ্যা

সাধারণভাবে মানুষ ধারণা করে থাকে যে অধিক সম্পদ এবং পার্থিব সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হওয়াই কল্যাণ ও সৌভাগ্য। তবে এর বিপরীতে যারা নিজেকে ঐশী পথের যাত্রী মনে করে তারা কল্যাণ ও সৌভাগ্য একমাত্র পরকালের সাফল্যের মধ্যে নিহিত বলে মনে করে। ফলে এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী ব্যক্তিরা পরকালের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী হওয়াকেও কল্যাণ বলে বিবেচনা করে।

উপরোক্ত বাণীতে হযরত আলী (আ.) পার্থিব সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্যকে কল্যাণ বলেন নি। কারণ এগুলো সবই নশ্বর, মানুষের চিরসাথী হিসাবে গণ্য নয়। কখনো কখনো এসব উপকরণ পরকালের অকল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইমাম আলী (আ.) কতক বৈশিষ্ট্যকে মানুষের মানবিক পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য হিসাবে কল্যাণকর বিবেচনা করেছেন। যেমন জ্ঞান, যা মানুষের (বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তার) চিন্তাশক্তির পূর্ণতার পরিচয় বহন করে। কিংবা ধৈর্যগত মহত্ত্ব অর্জন যা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং যা ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণতার অন্যতম নির্দেশক। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ পরিমাণ ও গুণগত উভয় দিকে (একদিকে ইবাদতের আধিক্য ও অন্যদিকে নিষ্ঠার সাথে তা সম্পাদন করা) ইবাদতকে উন্নীত করা এবং সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা ও মন্দ কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এটাও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারিক পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে। অতঃপর আমিরুল মুমিনীন পৃথিবীর

কল্যাণকে দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। হয় ব্যক্তিকে তওবার মাধ্যমে তার মন্দ ও অসৎ কর্মকে মুছে ফেলতে হবে ও ঐ পাপের কারণে সে যাকিছু সময়মত পালন করতে পারেনি সেগুলো পূরণ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হতে হবে (এবং এর মাধ্যমে স্বীয় আত্মাকে পূণ্য কর্মের জন্য প্রস্তুত করতে হবে), নতুবা তাকে অনন্তর সৎ কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকতে হবে (সৎ কর্মের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে হবে)। এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোন কল্যাণ নেই। পরিশেষে তিনি বলেছেন, যে কর্মের সঙ্গে আল্লাহ্ ভীতির সংযোগ রয়েছে তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন আসলে ক্ষুদ্র নয়। এ কথার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তির মধ্যে এ অনুভূতি ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে, পাপ মোচনের মাধ্যমে কৃত পাপের ক্ষতিপূরণ করা এবং কল্যাণকর কর্মের দিকে ধাবিত হওয়া তাকওয়া ও খোদাভীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরূপ কর্ম সামান্য নয়, কারণ তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয়েছে। আর যা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয় তার পুরস্কার মহান। এভাবে তিনি মানুষকে এ দুটি কর্মের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৭. সৎকর্মে অবহেলার ক্ষতি

ইমাম আলী (আ.) বলেন, 'যে কর্মে অবহেলা করে সে দুঃখে পতিত হয়। যে ব্যক্তি তার জীবন ও সম্পদে আল্লাহ্র জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করে না, তার প্রতি আল্লাহ্ কোন দৃষ্টি দেন না।'

ব্যাখ্যা

ইবনে মাইসাম 'অবহেলা'র স্থলে 'আল্লাহ্র জন্য কর্ম না করা' অর্থ করেছেন। এ অর্থ অনুসারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কোন কর্ম করে না এবং যার সকল কর্ম তার পার্থিব কামনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সে তা অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য অসহনীয় কষ্টে পতিত হয়। আর তা যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় এ ভয়ে সে সর্বদা ভীত থাকে। এখানে ইবনে মাইসাম একটি প্রসিদ্ধ উক্তি উল্লেখ করেছেন। উক্তিটির তাৎপর্য হচ্ছে 'পৃথিবী থেকে তোমার ইচ্ছামত সম্পদ আহরণ কর। অতঃপর তার জন্য দ্বিগুণ দুঃখ ও কষ্টের জন্য প্রস্তুত থাক।'

অতঃপর আলী (আ.) নিজের জীবন ও সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করতে নিষেধ করেছেন। কারণ যারা তাঁর পথে ব্যয় করে না তিনি তাদের প্রতি তাঁর রহমতের দৃষ্টি দেন না।

৮. আত্মসংযম ও কৃতজ্ঞতার স্থান

ইমাম আলী (আ.) বলেন, 'দারিদ্রের অলঙ্কার হল আত্মসংযম এবং সম্পদশীলতার অলঙ্কার হল (আল্লাহ্‌র প্রতি) কৃতজ্ঞতা।'

ব্যাখ্যা

যখন কোন দরিদ্র ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন তার আত্মিক উন্নতি ও বিকাশ ঘটে এবং সে একজন আত্মসংযমী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে যা তার অলঙ্কার হিসাবে গণ্য হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি আত্মসংযমী না হয় এবং তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসারী হয় তবে লোভ-লালসা, হিংসা, লাঞ্ছনার সহকারে অন্যের কাছে হাত পাতা প্রভৃতি মন্দ বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে শিকড় গাড়ে।

যে ব্যক্তি সম্পদশালী তার উচিত আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা। কারণ এ নিয়ামত আল্লাহ্‌ই তাকে দিয়েছেন। মানুষ শোকর আদায় করলে তার নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেন: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ 'এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তোমাদেরকে আমি আরো অধিক দিব।'

পক্ষান্তরে যদি কেউ নিয়ামতের শোকর আদায় না করে আল্লাহ্‌ তাকে কঠোর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে: وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও নিশ্চয় আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।' আল্লাহ্‌ মানুষকে যে নিয়ামত দিয়েছেন কেউ যদি সে কথা স্মরণ না রাখে তবে সে অহংকারী হয়ে ওঠে। যেমন পবিত্র কোরআন কারুনের ভাষ্য থেকে বর্ণনা করেছে: 'সে বলল, এসব (সম্পদ ও মর্যাদা) তো আমি আমার জ্ঞানের মাধ্যমেই অর্জন করেছি।' তার এরূপ বক্তব্য পরিণামে তার ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। তাই উক্ত বাণীতে হযরত আলী (আ.) সম্পদশালীদের আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার অলঙ্কারে সজ্জিত হতে উপদেশ দিয়েছেন।

৯. ভাগ্যের ব্যাখ্যা

একজন সিরিয়াবাসী হযরত আলী (আ.)-কে প্রশ্ন করলঃ সিরীয়ানদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ কি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত? তিনি বললেন, 'তোমার জন্য দুর্ভোগ। তুমি হয়তো ভেবেছ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অলঙ্ঘনীয় বিধান (ক্বাজা) এবং ভাগ্য (কাদার বা পরিমাপ)ও নির্ধারিত। কিন্তু যদি তাই হতো তবে অবশ্যই পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় অযথা গণ্য হতো এবং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও সতর্কাদেশও বৃথা পরিণত হতো। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছায় আমল করতে নির্দেশ দিয়েছেন[১] এবং (পাপ সম্পর্কে) সতর্ক করে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি তাদের ওপর সহজসাধ্য দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং কোন কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেন নি। তিনি ক্ষুদ্র আমলের জন্য অধিক পুরস্কার দিয়ে থাকেন। কেউ তাঁকে পরাভূত করে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে না। তিনি ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে নবীদের প্রেরণ করেন নি এবং তাঁর বান্দাদের জন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেন নি। তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং যা কিছু এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে বৃথা সৃষ্টি করেন নি।

ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿٢٧﴾

'(বরং) তা (সৃষ্টি বৃথা হওয়া) ঐ সকল লোকের ধারণা, যারা অস্বীকার করেছে। সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের দুর্ভোগ ।'[২]

ব্যাখ্যা

উপরোক্ত বাণীটি আমিরুল মুমিনীন (আ.) এর একটি পূর্ণ বাণী থেকে নেওয়া অংশবিশেষ। যখন তিনি মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন তখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেঃ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও অপরিহার্য বিষয়? উত্তরে তিনি প্রথমে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বলেনঃ তিনিই শস্যবীজ অঙ্কুরিত করেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেন। কোন ভূমিই আমরা অতিক্রম করি না এবং কোন উপত্যকায়ই আমরা অবতরণ করি না আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ও পরিমাপ ব্যতীত। তখন সে বলে,

---

১. সম্ভবত উদ্দেশ্য 'আমরে তাকভীনি' বা 'আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নির্দেশ' যা মানুষের সত্তায় নিহিত অর্থাৎ মানুষকে প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

২. সূরা সদ : ২৭।

তাহলে আমার দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপরই বর্তায়। অর্থাৎ আমার জন্য কোন পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্য হয় না। তখন তিনি বলেন: এ আলোচনা বর্জন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পুরস্কার ও প্রতিদানকে সমুন্নত করবেন। তোমাদের যাত্রা পথে যখন তোমরা যাত্রা কর এবং তোমাদের যাত্রা বিরতিকালে যখন যাত্রা বিরতি কর, কোন অবস্থাতেই তোমরা বাধ্য নও এবং তা করতে নিরুপায় নও। সে বলল: তাহলে আমাদের কার্যে আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও নির্ধারণের (ক্বাজা ও কাদার) স্থান কোথায়? তখন তিনি বলেন: দুর্ভোগ তোমার জন্য। এরপর বিষয়টি যে নির্ধারিত নয় তার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন: আদেশ-নিষেধ যা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে বর্ণিত হয় তা মানুষের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা থাকার কারণেই। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা শক্তিকে পরাভূত করে সৎকর্ম কিংবা পাপ কর্ম সম্পাদন করে। যেমনটি মনে করে থাকে শয়তানের দল ও সত্য থেকে অন্ধ কাদরীয়া সম্প্রদায়, যারা এই উম্মতের মাজুস বা অগ্নি উপাসক হিসাবে পরিগণিত হয়। বরং আমাদের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতার বিষয়টি আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে। অতঃপর ইমাম আলী (আ.) কাযা (قضا) শব্দটিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও হুকুম (বিধান) অর্থে ব্যাখ্যা করে পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ যেখানে কাযা (قضا) শব্দটি আল্লাহ্‌র এমন অলঙ্ঘনীয় শরীয়তের নির্দেশ বা আবশ্যক বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে ক্ষেত্রে বান্দার পালন করা বা না করার ক্ষেত্রে সত্তাগত স্বাধীনতা রয়েছে তবে যদি সে তা পালন না করে, অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইমাম তাকে পূর্ণাঙ্গ উত্তর প্রদান করায় সে খুশী হয়ে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে:

‘আপনিই সেই ইমাম আমরা যার আনুগত্যের প্রত্যাশী
যার আনুগত্যের মধ্যে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌র নিহিত সন্তুষ্টি
আমাদের ধর্মে যা কিছু অস্পষ্ট ছিল তিনি স্পষ্ট করেছেন তা
আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রদান করুন উত্তম পুরস্কার যা।’

ইবনে মাইসাম বলেন: উদ্ধৃত বাণীতে ‘দুর্ভোগ তোমার জন্য ’ কথাটির মধ্যে দয়া ও ভালবাসার পরশ রয়েছে। সে যখন ইমামকে প্রশ্ন করে– যদি আমাদের যুদ্ধ করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবধারিত হয় তবে সওয়াব ও শাস্তির বিষয়টি বৃথা গণ্য হয়। কেননা কাযা শব্দের অর্থ সৃষ্ট। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে তিনি বান্দার মাধ্যমে যা কিছু

সৃষ্টি করেন তাই হল কাযা। এ অর্থে যেহেতু বান্দার কর্ম আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন তাই বান্দার তাতে কোন স্বাধীনতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে বান্দাকে পুরস্কার বা শাস্তি দানের কোন যুক্তি থাকে না। তার এরূপ ধারণার কারণ হল সে মনে করেছে কাযা (قضا) ও কাদার (قدر) এর অর্থ হচ্ছে যে এ বিষয়ে আল্লাহর পূর্বতন জ্ঞান বাধ্যতার সৃষ্টি করে। ফলে সে পরবর্তীতে সে অনুসারে ঘটনা সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ইমাম আলী (আ.) তা খণ্ডন করে কাযা শব্দটিকে নির্দেশ অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ সম্পর্কে সূরা ইস্রার আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ আয়াতকে যুক্তি হিসাবে উপস্থাপনের কারণ হল কাযা (قضا) কথাটি নির্দেশ অর্থে হলে তা বান্দার কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে নাকচ করে না।

কখনো কখনো কাযা অর্থ মহান আল্লাহ্র মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের সকল কিছুর সার্বিক ও স্বতন্ত্র রূপকে অবস্তুজগতে সৃষ্টি করা। অতঃপর যখন বস্তুজগতে ঐ বস্তুর সৃষ্টির উপযোগিতা সৃষ্টি হয় তখন একটির পর একটি বস্তু প্রচ্ছন্ন অবস্থা (চড়ঃবহঃরধষ পড়হফরঃরড়হ) থেকে বাস্তব রূপে (অপঃঁধষ পড়হফরঃরড়হ) আবির্ভূত হয়। সুতরাং কাদার- এর অর্থ বস্তুজগতে বস্তুর একের পর এক উৎপত্তি লাভ। যেমনটি পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

'এবং এমন কোন বস্তু নাই যার (অফুরন্ত) ভাণ্ডারসমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাপ ব্যতিরেকে তা অবতীর্ণ করি না।'[১]

উপরোক্ত অর্থেও কাযা কথাটি ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর হয়। কারণ এ অর্থেও কাযা ব্যক্তির স্বাধীনতা, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা বা না করা, পুরস্কার কিংবা শাস্তি লাভ ইত্যাদি বিষয়কে নাকচ করে না। বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেহেতু স্বাধীনতার অর্থ বান্দার এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা যে, তার মধ্যে কোন কর্ম সাধন বা বর্জন করার সম্ভাব্য সাধ্য বিদ্যমান (প্রস্তুত)। যখন তার ইচ্ছা ঐ কর্মের দিকে ধাবিত হয় তখন সে তা সাধন করে, আর যখন ঐ কর্মের প্রতি তার অনিচ্ছা থাকে তখন সে তা বর্জন করে। তাই উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ কর্মটি সম্পাদিত হোক বা না

১. সূরা হিজর : ২১।

হোক, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের প্রভাব তার ওপর কোন ভূমিকা রাখে না। যদিও এ অপরিহার্যতার প্রভাব সে প্রাকৃতিকভাবেই আল্লাহ্ থেকে লাভ করে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানে যা রয়েছে তা থেকে যে দায়িত্ব বান্দার ওপর অর্পিত হয় তা সাধিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য দুটি উৎস রয়েছে। একটি হচ্ছে কর্তৃগত অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট জগত এমনভাবে সৃষ্টি হওয়া যার মধ্যে সর্বোত্তম রূপ রয়েছে। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে:

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٢

'আপনি আপনার মহামহিম প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করেন এবং পূর্ণাঙ্গ ও সুষম করেন।'[১]

অবশ্য এই সৃষ্টির মধ্যে যে অপূর্ণতা রয়েছে (যদিও তাতে কোন ত্রুটি নেই) তাকে পূর্ণতা দানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাও এই সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিহিত রেখেছেন, যাতে তা ঐ পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে। (এ পূর্ণতা সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটলেও মানুষের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই তার স্বাধীন ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল) যেমন উক্ত আয়াতের ধারাবাহিকতায় ইরশাদ হয়েছে:

وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ 'এবং তিনি তার পরিমাণ নির্ধারণ ও পথ নির্দেশ করেন।'[২]

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্রহীতার দিক। মানুষের ঐচ্ছিক পূর্ণতার ক্ষেত্রে গ্রহীতা হিসাবে তার মধ্যে স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাধীনতার কিছু অপরিহার্য ও প্রজ্ঞাগত কল্যাণময় দিক রয়েছে। আমিরুল মুমিনীন (আ.) তার মধ্যে দশটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা:

- তাদেরকে স্বাধীনভাবে পথ নির্বাচন করার নির্দেশ।
- তাদেরকে সাবধানতার বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন (সেগুলোর নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন)।

---

১. সূরাআ'লা : ১-২।

২. অর্থাৎ তার পূর্ণতা ও বিকাশের জন্য সকল উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে তার জন্য ঐ পথকে দেখিয়ে দেন।

- সহজসাধ্য দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যাতে তারা সহজেই তা সম্পাদন করতে পারে ও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।
- কঠিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি অর্থাৎ সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন নি। যেমন পবিত্র কোরআনে বলেছেন: 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান, যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর (কষ্টসাধ্য) তা চান না।'
- সামান্য কর্মের বিনিময়ে অধিক প্রতিদান। যদিও এটি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহজনিত, তদুপরি এটি তাদের কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত।
- মানুষ তাদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে কোন কর্ম সম্পাদন করার অর্থ আল্লাহ্কে পরাস্ত করা নয়। কারণ তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং স্বীয় বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। যদিও তিনিই বান্দা ও তার কর্মের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এবং স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। এ বিষয়টিও তার স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেউ বাধ্য হয়ে তাঁর আনুগত্য করে না। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি কাউকে বাধ্য করেন না। বান্দার স্বাধীনতার অপরিহার্য দাবিও তাই।
- তিনি নবীদেরকে ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন নি। বরং সুসংবাদদতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন এটা জানিয়ে যে, যারা তাঁর আনুগত্য করবে তাদের জন্য বেহেশত রয়েছে। আর যারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। এটিই মানুষের স্বাধীনতার স্বাভাবিক পরিণতি।
- তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য অনর্থকভাবে ঐশী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন নি। বরং এর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের বিষয়গুলো জানিয়ে দিয়েছেন। যা তাদের স্বাধীনতার সীমাকে নির্ধারণ করে। তাই ঐশী গ্রন্থ প্রেরণের সাথেও তাদের স্বাধীনতার সম্পর্ক রয়েছে।
- আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অযথা সৃষ্টি করা হয় নি। বরং তা ঐশী প্রজ্ঞা ও কল্যাণ চিন্তা থেকে উদ্ভূত। যেমন, এসব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে বান্দা তাকে যে চিন্তা শক্তি দেওয়া

হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে সুশৃঙ্খল এ বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে যে ঐশী প্রজ্ঞা বিদ্যমান তা অনুভব করে এবং মহান আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব, মহিমা ও পূর্ণতার গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। পবিত্র কোরআনে এ দিকটির প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে: 'নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এ পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে। হযরত আলী (আ.) তাঁর বাণীর শেষে সূরা সোয়াদ এর ২৭ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতিই ইশারা করেছেন।

১০. উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহই মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন. 'মানুষের মূল্য তার আকাঙ্ক্ষার মহত্ত্বের ওপর,তার সত্যবাদিতা তার ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ত্বের মাত্রার ওপর,তার শৌর্য তার অপমানবোধের তীব্রতার ওপর এবংতার আত্মসম্মানবোধ তার নৈতিক সততার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।'

ব্যাখ্যা:

এ বাণীতে আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যার ওপর নির্ভর করে অপর চারটি বিষয়। সেগুলো হচ্ছে:

১. আকাঙ্ক্ষা থেকে ব্যক্তির মর্যাদা নিরূপণের কথা বলেছেন। মানুষের যদি সৎকর্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তাতে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তেমনি কারো যদি সৎকর্মের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে তবে সে অসম্মানিত হিসাবে গণ্য হয়। যেমন কারো আকাঙ্ক্ষা শুধু এতটুকু যে স্বীয় উদরকে পূর্ণ করবে, আবার কারো আকাঙ্ক্ষা মানব জাতির উপকার সাধন করবে। এ দুই ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদাগত ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

২. মানুষের ব্যক্তিত্বকে সত্যবাদিতা যাচাইয়ের মানদণ্ড বলেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে যতটুকু মনুষ্যত্ত্ব রয়েছে তা তার সত্যবাদিতার পর্যায়কে নির্দিষ্ট করে। কারণ মনুষ্যত্ত্ব ব্যক্তিকে উত্তম কর্মে ব্রতী করে এবং যে কাজ মানবোচিত নয়

কিম্বা ব্যক্তির মর্যাদার জন্য হানিকর (কিংবা তার জন্য ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়) তা সে পরিহার করে চলে। এ বৈশিষ্ট্য কথার ক্ষেত্রেও তাকে সংযত রাখে। ফলে সত্যবাদিতা তার সত্তাগত গুণে পরিণত হয়। যে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব যত বেশি থাকবে সে তত বেশি সত্যবাদী হবে।

৩. এ বাণীতে অপমানবোধকে শৌর্য ও সাহসিকতার উৎস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ অপমানবোধ মানুষের মধ্যে আত্মসম্মানের পরিপন্থী যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে ক্রোধের উদ্রেক করে ও প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য করে যা ব্যক্তির সাহসিকতার নিদর্শন। যে ব্যক্তির মধ্যে অপমানবোধ যত বেশি তার মধ্যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াও তত তীব্র, যার প্রকাশ হচ্ছে সাহসিকতা।

৪. হযরত আলী (আ.) আত্মসম্মানবোধকে নৈতিক সততার উৎস বলেছেন। মানুষ যেমন তার পছন্দনীয় ও তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে অন্যের অংশীদারিত্বকে অপছন্দ করে, তেমনি তার বিশ্বাসের কোন বিষয় যা সংরক্ষণ করা নিজের ওপর অপরিহার্য বলে মনে করে তার প্রতি যে কোন ধরনের আক্রমণ ও আঘাতকে অসহনীয় জ্ঞান করে। যেহেতু তার বিবেচনায় অন্যদের জন্য এ সীমা অতিক্রম অমার্জনীয় অপরাধ, সেহেতু সে এসব বিষয়ে স্পর্শকাতরতা প্রদর্শন করে। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এই প্রকৃতিগত স্পর্শকাতরতাকে আত্মসম্মানবোধ (غیرت) বলা হয়।

বিশেষ নিবন্ধ

ইসলামি ঐক্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইমাম হাসান (আ.) ও তাঁর সন্ধিচুক্তি

আয়াতুল্লাহ আলী কারিমী জাহরুমী

ইমাম হাসান (আ.)-এর পবিত্র জন্ম এবং তাঁর শৈশব

তৃতীয় হিজরির ১৫ রমযানে পবিত্র নগরী মদিনাতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর 'সুগন্ধি ফুল' ও প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তবে কিছু সূত্রে দ্বিতীয় হিজরিতে তাঁর জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে হয়েছে।[১] তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রাণপ্রিয় বড় দৌহিত্র এবং ইমাম আলী (আ.) ও নারীকুলের শিরোমণি হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)-এর প্রথম সন্তান। ইমাম হাসানের উপনাম হচ্ছে 'আবু মুহাম্মাদ'। তাঁর অনেক পদবি রয়েছে এবং প্রতিটি পদবিই মর্যাদাপূর্ণ। তাঁর পদবিগুলো হলো ত্যাইয়েব, ত্বাকী, সিবত, যাকী, সাইয়্যেদ, ওলী ও মুজতাবা। অবশ্য সিবতে আকবার (বড় দৌহিত্র) পদবিও অনেক প্রসিদ্ধ।

হযরত আনাস বিন মালেক বলেন : 'ইমাম হাসান (আ.) ব্যতীত কেউই হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর এত সদৃশ ছিল না।'[২]

ইমাম হাসান (আ.) উত্তম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লালিত পালিত হয়েছেন

ইমাম হাসান ইবনে আলী (আ.) যেদিন এই পৃথিবীতে আগমন করেন, ঠিক সে দিন থেকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম প্রশিক্ষকের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা শুরু করেন। সর্বদা তাঁর দৃষ্টি মহানবীর এবং তাঁর উত্তম নৈতিক চরিত্রের প্রতি ছিল এবং

---

১. মিশরীয় লেখক ও চিন্তাবিদ ফরিদ ওয়াজদি, দায়েরাতুল মায়ারেফের ৩য় খণ্ডের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় হিজরতের ছয় বছর পূর্বে ইমাম হাসান (আ.)-এর জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, তখন পর্যন্ত ইমাম আলী এবং হযরত ফাতিমার মধ্যে বিবাহ হয় নি।

২. কাশফুল গুম্মাহ ফি মা'রেফাতিল আইম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৬।

সর্বদা মহানবীর সুমধুর কণ্ঠ তাঁর কণ্ঠে বাজত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজ গৃহে হাসান বিন আলীকে মহত্ত্ব, দয়ার্দ্রতা এবং মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পন্থা শিখিয়ে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ দেখাতেন এবং তাঁকে সর্বদা সৎ, আদর্শ এবং নিষ্ঠাবান হিসেবে গড়ে তোলেন। নিজের সাথে তাঁকে মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং নিজের পাশে বসাতেন। মহান আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও শিষ্টাচার সম্পর্কে তাঁকে প্রশিক্ষণ দিতেন।

'আল ফাজায়েল' গ্রন্থে ইবনে শাহরে আশুব বর্ণনা করেন : নাজিয়া নামক ইসলামি শিক্ষালয়ে আবুল ফুতুহ তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন : সাত বছর বয়স থেকে হাসান ইবনে আলী (আ.) মহানবী (সা.)-এর মজলিশে অংশগ্রহণ করতেন এবং ওহীর বিষয়বস্তুসমূহ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং সেগুলো মুখস্থ করতেন। পরে তাঁর মায়ের নিকট এসে সেগুলো বর্ণনা করতেন। যখন হযরত আলী (আ.) ঘরে ফিরতেন, তখন দেখতেন যে, মসজিদে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে বিষয়গুলো বলেছেন, সে সম্পর্কে হযরত ফাতিমা অবগত রয়েছেন এবং সকল খুঁটিনাটি বিষয় জানতেন; আলী (আ.) তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করতেন : 'এগুলো তুমি কীভাবে জেনেছ?' ফাতিমা (আ.) উত্তরে বলতেন : 'আপনার সন্তান হাসানের মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি।'

তিনি শৈশবকাল থেকেই আল্লাহর রাসূলের নিকট থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। আল্লাহর রাসূলের নিকট থেকে তাহাজ্জুদ ও রাতের ইবাদতের জন্য অতি রহস্যময় দোয়া শিখতেন।

ইমাম হাসানের কোরআন মজীদ তিলাওয়াত

পবিত্র কোরআনের সাথে ইমাম হাসানের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে সূরা কাহাফের প্রতি তাঁর অন্যরকম আকর্ষণ ছিল। জাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে : ইমাম হাসান (আ.) ঘুমানোর জন্য যখনই বিছানায় যেতেন, তখনই সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করতেন।[১]

---

১. ইহকাকুল হাক্ক, ১১ নং খণ্ড, (মালহাক্কাত) পৃ. ১১৪, সিরা আয়লামুল নাবলায় গ্রন্থ হতে।

ইমাম হাসান (আ.)-এর সাহসিকতা ও বীরত্ব

ইমাম হাসান মুজতাবা অপরিসীম সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন। শৈশব থেকে তিনি তাঁর পিতার মতই সাহসী এবং বীর ছিলেন। জামালের যুদ্ধে ইমাম আলীকে বিভিন্ন দিক থেকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার পক্ষে তালহা ও যুবাইরসহ অন্য যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও আরব গোত্রের অনেক যুবকই হযরত আয়েশার উটের পাশে অবস্থান করে যুদ্ধ করছিল। হযরত আলী (আ.) তাঁর সন্তান মুহাম্মাদ হানাফিয়াকে ডেকে বললেন : 'এ বর্শাটিকে নিয়ে সরাসরি আয়েশার উটের দিকে ধাবিত হও।' (এবং উটটিকে হত্যা কর যাতে হাওদাটি পড়ে যায়)। মুহাম্মাদ হানাফিয়া যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করলেন, কিন্তু যাব্বা গোত্রের লোকেরা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো এবং তাঁকে উটের নিকট যেতে দিল না। ফলে তিনি তার পিতার নিকট ফিরে আসলেন। অতঃপর ইমাম হাসান (আ.) বর্শা নিয়ে হযরত আয়েশার উটের দিকে ধাবিত হন এবং বর্শা দিয়ে উটটিকে হত্যা করেন। অবশেষে, জামালের যুদ্ধের জয় ইমাম হাসানের মাধ্যমে সংগঠিত হয়।

আমীরে মুয়াবিয়াকে ইমাম হাসান (আ.)-এর দাঁতভাঙ্গা জবাব

একদা ইমাম হাসান (আ.) আমীরে মুয়াবিয়ার নিকট ছিলেন। মুয়াবিয়া ইমাম হাসানকে (আ.) বললেন : 'হে হাসান! আমি তোমার থেকে উত্তম!' ইমাম হাসান বললেন : 'কিভাবে হে হিন্দার সন্তান?'

মুয়াবিয়া বললেন : 'এ জন্য যে, জনগণ আমার পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করেছে এবং আমার খেলাফতকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তোমার পক্ষে তারা ঐকমত্য পোষণ করে নি।'

ইমাম হাসান (আ.) বললেন : 'তুমি অযৌক্তিক কথা বললে। হে হাজমার কলিজা ভক্ষণকারী নারীর সন্তান! তুমি অন্যায়ভাবে খেলাফত আত্মসাৎ করেছ! যারা তোমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে, তারা দু'দলের অন্তর্ভুক্ত : অনুসারী অথবা অপারগ ও বাধ্য। সুতরাং যারা তোমার অনুসারী তারা আল্লাহর অবাধ্য হিসেবে গণ্য এবং যারা

জোরপূর্বক এবং বাধ্য হয়ে এসেছে তারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অসহায়। আর আমি কখনোই বলব না যে, আমি তোমার হতে উত্তম; কারণ, কোন প্রকার ভালো লক্ষণ তোমার মধ্যে নেই। যেমন ভাবে আল্লাহ আমাকে হীনতা হতে মুক্ত রেখেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তোমাকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে দূরে রেখেছেন।[১]

লক্ষণীয় যে ইমাম প্রথমত মুয়াবিয়াকে 'হিন্দার সন্তান' বলে অভিহিত করেছেন যেন তিনি তাঁর মন্দ অতীতেকে স্মরণ করেন এবং এর পরই তাঁকে 'কলিজা ভক্ষণকারীর সন্তান' হিসেবে অভিহিত করেছেন যেন তাঁর মা হিন্দা ওহুদের যুদ্ধে হযরত হামযার কলিজা ভক্ষণ করেছিল সে কথা তাঁর স্মরণে থাকে এবং এ অপমানজনক ঘটনা তাঁর হৃদয়ে জীবিত থাকে। সবশেষে বলেন : 'মহান আল্লাহ তোমাকে সকল মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হতে দূরে রেখেছেন।'

ইমাম হাসান (আ.)-এর সন্ধিচুক্তি

ইমাম হাসান (আ.)-কে তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমীরে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপন সেসব সমস্যারই অন্যতম। মুয়াবিয়ার সাথে ইমাম আলী (আ.)-এর সিফফিন যুদ্ধের সালিশের ঘটনার ফলে সমাজের যে পরিবর্তন ঘটে এটি ছিল তারই ধারাবাহিকতা এবং শেষ পর্যন্ত এই মহান ব্যক্তিকে শাহাদাত বরণ করতে হয়। ইমাম হাসানের সন্ধির ঘটনার ফলে তাঁর সাথিদের মধ্যে বিভেদ কমে এসেছিল। তবে তাদের মধ্যকার একটি দল সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে প্রতিবাদ করে তাঁকে তিরস্কার করতে থাকে এবং তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ শুরু করে দেয়। এখানে আমরা মুয়াবিয়া এবং ইমাম হাসান (আ.)-এর মধ্যকার সন্ধির ঘটনাকে তিনটি ভাগে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করব :

১. ইসলামে সন্ধির পূর্ব দৃষ্টান্ত
২. ইমাম হাসানের সন্ধির প্রেক্ষাপট ও সন্ধির শর্তাবলি
৩. সন্ধির কল্যাণ

---

১. মানাকিবে আলে আবি তালিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২।

ইসলামে সন্ধির পূর্ব দৃষ্টান্ত

সন্ধি ও আপোসের বিষয়টি পবিত্র কুরআনে এসেছে। উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, পারিবারিক বিভেদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ [১]

যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর থেকে সীমা লঙ্ঘন অথবা উপেক্ষার (তালাকের) ভয় করে, তবে তারা আপোসে পরস্পর মীমাংসা করে নিলে উভয়ের উপর কোন গুনাহ নেই। কেননা, আপোসে মীমাংসাই উত্তম।

যুদ্ধ ও বিবাদের ব্যাপারে দু'পক্ষের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ [২]

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজেও কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সাথে সন্ধি করেছেন। ষষ্ঠ হিজরির জ্বিলকদ মাসে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ওমরা পালনের জন্য মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। এ সম্পর্কে কুরাইশ গোত্রের কাফেররা অবগত হয় এবং

১. সূরা নিসা, আয়াত ১২৮।
২. সূরা হুজুরাত, আয়াত ৯।

তারা মহানবী (সা.)-কে মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁকে বাধা প্রদান করে। কুরাইশদের সাথে একটি সন্ধির মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন এবং পরের বছরে হজে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সন্ধির শর্তসমূহ অনেক সাহাবীর কাছেই অসম্মানজনক মনে হওয়ার তাঁরা অসন্তুষ্ট হন।

এরপর যে সন্ধিটি হয় তা হযরত ইমাম হাসান (আ.)-এর সময়ে। অবশ্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ সন্ধির ব্যাপারে বেশ কয়েক বার ইশারা করেছেন। রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু বকর বলেছেন : একদা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) খুতবা পাঠ করছিলেন। খুতবা চলাকালীন হঠাৎ করে ইমাম হাসান (আ.) মিম্বারে উঠতে শুরু করলেন। মহানবী (সা.) তাকে কোলে নিয়ে বললেন : 'এ আমার সন্তান এবং বংশধর। আশা করছি, মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন।'[১]

সন্ধির প্রেক্ষাপট ও সন্ধির শর্তাবলি

ইমাম আলী (আ.) এবং তাঁর পরিবারকে মুয়াবিয়া সর্বদা শত্রুর দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি নিজের সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইমাম আলীর সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। ইমাম আলী সম্পর্কে শামের অধিবাসীদের নিকট মিথ্যা প্রচারনা চালিয়ে তাঁর সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করেছিলেন। আমীরুল মুমিনীন আলীর শাহাদাতের ঘটনা শুনে মুয়াবিয়া বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তিনি কখনো চিন্তা করেন নি যে, হযরত আলীর শাহাদাতের পর অন্য কেউ তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ঘটনাক্রমে তার নিকট খবর পৌঁছে যে, প্রথম দিন তথা ইমাম আলীর পবিত্র দেহ দাফনের পরই (২১ রমযান) জনগণ একত্রিত হয়ে ইমাম হাসানের নিকট বাইয়াত করে।

এ ঘটনাটি মুয়াবিয়ার নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল এবং এ বিষয়টি তিনি কোনভাবেই সহ্য করতে পারেন নি। যে ব্যক্তি ইমাম আলীর সাথে যুদ্ধ করেছেন ও তাঁকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর খিলাফতকে কোন ভাবেই গ্রহণ করেনি, সেই ব্যক্তি কিভাবে ইমাম আলীর সন্তানের খিলাফতকে গ্রহণ করবেন?

১. আল ফুসুলুল মুহিম্মা, ইবনে সাব্বাগ মালেকি, পৃ. ১৫৮।

ইমাম হাসানের খলিফা হওয়ার বিষয়টি মুয়াবিয়াকে ভীষণভাবে চিন্তিত করলো। বিশেষ করে ইমাম হাসানের আকর্ষণীয় একটি খুতবা দেওয়ার পর। এ খুতবায় ইমাম হাসান (আ.) নিজের ও তাঁর পরিবারের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং অবশেষে এ খুতবার মাধ্যমে জনগণকে বুঝিয়েছেন যে, খিলাফতের জন্য তিনি অন্য যে কারো তুলনায় উত্তম এবং অন্য কেউ এসকল শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং তারা খেলাফতের পদের যোগ্য নয়।

এ খুতবার পর ইমাম হাসান (আ.) বিভিন্ন শহর ও কেন্দ্র পরিচালনার জন্য দ্রুত শাসক নিয়োগ করেন এবং বসরার শাসক হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে প্রেরণ করেন।

পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্য মুয়াবিয়া ইরাকের বিভিন্ন শহরে গুপ্তচর পাঠান। এ সকল গুপ্তচর ইরাকের খবর আদান-প্রদান করত। তারা ইমাম হাসানের খেলাফতের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দিত।

এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার উদ্দেশে পাঠানো একটি চিঠিতে বলেন, 'তুমি এখন পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করছ। তুমি হয়ত এটা চেষ্টা করছ যে, এখন কোন সমস্যা (যুদ্ধ) সৃষ্টি হোক। যদি তাই হয়, তাহলে অপেক্ষায় থাক। আমি শুনেছি–ইমাম আলীর শাহাদাতকে–তুমি তিরস্কার করেছ। এটি এমন একটি ঘটনা, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই যে ব্যাপারে তিরস্কার করে না। তুমি প্রস্তুত থেক।'

মুয়াবিয়া এ চিঠির উত্তর পাঠান এবং ইমাম আলীর শাহাদাতের খবর পেয়ে তিনি যে উৎসব করেছিলেন তা অস্বীকার করে বলেন : 'তাঁর মৃত্যুতে না আমি শোকাহত হয়েছি, না আনন্দিত হয়েছি, না তিরস্কার করেছি আর না অনুশোচনা করেছি।'

ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার উদ্দেশে অপর একটি চিঠি লেখেন এবং চিঠিটি দু'জন মুমিন ব্যক্তির মাধ্যমে মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করেন। এ চিঠিতে মুয়াবিয়াকে ইমাম হাসানের কাছে বাইয়াত করার কথা বলা হয়েছিল। চিঠিতে ইমাম হাসান (আ.) লেখেন : 'তুমি যে বিপথে চলছ, তা থেকে ক্ষান্ত হও। আমার হাতে বাইয়াত কর (যেখানে সকল জনগণ বাইয়াত করেছে)। তুমি এটা ভালো করে জান, তোমার থেকে আমি খেলাফতের জন্য আল্লাহর দরবারে এবং যারা আল্লাহর পথে পরিচালিত হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহর প্রতি সংযমশীল হও এবং অত্যাচারের পথকে

ছেড়ে দাও। মুসলমানদের রক্তকে রক্ষা কর। আল্লাহর শপথ! তোমার জন্য কোন সুসংবাদ নেই যে, তুমি জনগণের রক্ত ঝরানোর পর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। যে ব্যক্তি তোমার থেকে উত্তম তার সাথে এ ব্যাপার নিয়ে বিবাদ কর না। তুমি যদি বিবাদ না কর তাহলে আল্লাহ তাআলা শত্রুতার আগুনকে নিভিয়ে দেবেন। তোমার অধীনে সকলকে ডাক এবং তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। যদি তুমি সিদ্ধান্ত নাও যে, তোমার বিপথে চলা অব্যাহত রাখবে, তাহলে জেনে রেখ মুসলমানদের নিয়ে আমি তোমার নিকট এসে তোমার বিচার করব এবং আল্লাহ আমাদের মধ্যে বিচারক হবেন। কারণ, তিনি সর্বোত্তম বিচারক।'

কিন্তু মুয়াবিয়াএ চিঠির বিপরীত পথ অবলম্বন করেন। তাঁর চিঠির একাংশে এ কথা বলেন : 'যদি জানতাম যে, আপনি উম্মতের জন্য ও বাইতুল মাল সংগ্রহ এবং ইসলামের শত্রুদের প্রতিরোধের জন্য আমার থেকে যোগ্য ও উত্তম, তাহলে আপনার আহ্বানে সম্মতি প্রদান করতাম। তবে আপনি নিজেও জানেন, আমি দীর্ঘ দিন যাবত মুসলমানদের ওপর শাসন করে আসছি ও আমার অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক জ্ঞান এবং বয়স আপনার চেয়ে বেশি। সুতরাং আপনি আমার নেতৃত্বকে গ্রহণ করুন। আমার পর আপনি মুসলমানদের ওপর শাসন করবেন। ইরাকের সকল বাইতুল মাল আপনার অন্তর্ভুক্ত। ইরাকের যে কোন প্রান্তের খাজনা আপনি গ্রহণ করবেন। প্রতি বছর আপনার দূতকে প্রেরণ করবেন এবং সে খাজনা সংগ্রহ করে আপনর নিকট নিয়ে যাবে...'

ইমাম হাসানের দুই দূতকে তিনি বলেন : 'তোমরা ফিরে যাও। আমার এবং তোমাদের মধ্যে তলোয়ার ব্যতীত অন্য কোন কথা নেই।'

মুয়াবিয়া তাঁর শাসনাধীন সকল স্থানে চিঠি লিখে ইমাম হাসান (আ.)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করেন। তিনি ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে শাম থেকে ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা হন। এ খবর ইমাম হাসানের নিকট পৌঁছলে ইমাম নিজের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রস্তুত হতে বলেন এবং কুফার জনগণের সাথে আলোচনা করার জন্য তাদেরকে দাওয়াত করেন। তারা একত্রিত হলে খুতবা পাঠ করেন এবং তাদেরকে জিহাদ ও ধৈর্য্যের জন্য আহ্বান জানান। তিনি সকলকে নুখাইলা সামরিক ঘাঁটিতে সমবেত হওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু তারা ইমামের কথার উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ থাকে। তখন হযরত আদি বিন হাতেম অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে তিরস্কার করেন

এবং ইমাম হাসানকে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করেন। ইমাম হাসান নিজেই নুখাইলায় গমন করেন এবং কুফার শাসনভার হযরত আবদুল মুত্তালিবের একজন বংশরের ওপর অর্পণ করেন। ইমামের নির্দেশে তিনিও কুফার জনগণকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন।

ইমাম হাসানের আহ্বানে অনেকেই জিহাদের জন্য সেনাদলে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আলী (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ ছিল খারেজি; খারেজিরা যদিও ইমাম হাসানকে ভালোবাসত না, তবু তারা যে কোন ভাবে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। কেউ কেউ গনিমত পাওয়ার আশায় ইমামের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। এছাড়াও স্ব স্ব গোত্রের নেতাদের অনুসারীরা–যাদের কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল না– গোত্রপ্রীতির কারণে ইমামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ বিষয়গুলো পরবর্তীকালে ইমামের সেনাদলের আচরণ থেকে প্রকাশিত হয়।

যুদ্ধের জন্য সেনাদল গঠিত হলে ইমাম হাসান (আ.) তাঁর সেনাদল নিয়ে রওয়ানা হয়ে মাদায়েনে পৌঁছেন। তাঁরা সেখানে রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সকাল বেলা ইমাম হাসান সকলকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। ইমাম (আ.) তাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। বক্তব্যটি এমন ছিল : 'মহান আল্লাহর শপথ! আমি আশা করছি, সমস্ত মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব। আমি কখনো মুসলমানকে শত্রু মনে করি না। তারা কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হোক এবং তাদের কোন সমস্যা সৃষ্টি হোক তা আমি চাই না। সমঝোতা ও ঐক্য, যা তোমরা পছন্দ কর না। তোমাদের যা পছন্দ তা হচ্ছে বিভেদ ও বিক্ষিপ্ততা। জেনে রেখ, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু চিন্তা করছি, যা তোমাদের চিন্তা থেকে উত্তম। অতএব, আমার নির্দেশের বিরোধিতা কর না এবং আমার মতামতকে অগ্রাহ্য কর না। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমার ও তোমাদের জন্য যে জিনিস বন্ধুত্বমূলক এবং সন্তুষ্টিদায়ক হবে, তিনি সেদিকেই পথ প্রদর্শন করুন।'

এ সময়ে তারা একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল : 'এ কথা থেকে তোমরা কী বুঝতে পারছ?' তারা বলল : 'আল্লাহর শপথ! তিনি মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি এবং তার হাতে খিলাফত হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল :'আল্লাহর শপথ! এই ব্যক্তি কাফের হয়ে গিয়েছে।'

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ইমাম হাসানের সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই ছিল খারেজি। তারা ইমাম হাসানকে কাফের বলতেও দ্বিধা করেনি। তারা অনেক যোদ্ধাকে বিভ্রান্তও করে ফেলে। তারা ইমামের তাঁবুতে হামলা করে সব কিছু লুট করে। এমনকি ইমামের পায়ের নিচ থেকে তাঁর জায়নামাযও কেড়ে নিয়েছিল। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইমামের ঘাড় থেকে আবা (শরীরের ওপরের ঢিলা পোশাক) টেনে নেয়। ইমাম তাঁর জামার ওপর কোন বহিরাবরণ ছাড়াই নিজের তলোয়ার বহন করছিলেন। তিনি নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠলেন। এসময় তাঁর কয়েকজন বিশেষ সঙ্গী ও অনুসারী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল, যাতে তিনি এ ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে পারেন। ইমামের নির্দেশে রাবিয়া ও হামদান গোত্রের সৈন্যরা ইমামকে রক্ষার জন্য তাঁর চারপাশে অবস্থান নিল এবং তাদের নিরাপত্তায় ইমাম হাসান ঐ ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে গেলেন। হঠাৎ বনি আসাদের হাররা ইবনে সিনান নামক এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে ইমামের নিকট এসে ইমাম যে ঘোড়ার গাধার[১] পিঠে বসেছিলেন, তার লাগাম ধরে বলল : 'আল্লাহু আকবার, হে হাসান! আপনি মুশরিক হয়ে গিয়েছেন!' সে তার ক্ষুদ্র ছোড়া দিয়ে ইমামের উরুতে আঘাত করল। এ আঘাত ইমামের উরুর হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ইমাম হাসানের এক সাথি এসে তলোয়ার দিয়ে ঘাতককে হত্যা করে।

অতঃপর ইমামকে একটি খাটিয়ার ওপরে উঠিয়ে মাদায়েনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সায়িদ ইবনে মাসুদ সাকাফির [যিনি আলী (আ.) কর্তৃক নিয়োজিত মাদায়েনের গভর্নর ছিলেন এবং ইমাম হাসান (আ.) তাঁকে তাঁর পদে বহাল রেখেছিলেন] বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁর চিকিৎসা করা হয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই ইমাম হাসানকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অপর দিকে ইমাম হাসানের সাথে থাকা সৈন্যদের মধ্য থেকে কোন কোন নেতা মুয়াবিয়ার নিকট গোপনে চিঠি লিখে তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে এবং তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পথ চলা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়। তারা চিঠিতে লেখে : 'আপনি এসে আমাদের সাথে একত্রিত হন। যখন আপনি আমাদের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান

১. পূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে, ইমাম নিজের ঘোড়া পিঠে উঠেছেন এবং এখানে গাধার কথা বলা হয়েছে। হয়ত ইমাম পথিমধ্যে বাহন পরিবর্তন করেছেন।

করবেন, তখন আমরা ইমাম হাসানকে আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করব অথবা তাঁকে হত্যা করব।' এই দুঃখজনক খবর ইমাম হাসানের নিকট পৌঁছে।

মুয়াবিয়াকে ইরাকে প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য ইমাম হাসান (আ.) এক দল সৈন্যসহ উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাসকে প্রেরণ করেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাসও ইমামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মুয়াবিয়া যখন বাগদাদের নিকটবর্তী অঞ্চল হাব্বুনিয়া অথবা এখনুনিয়ায় পৌঁছলেন তখন উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিকট দূত প্রেরণ করে তার সাথে দেখা করা এবং তাকে সাহায্য করার কথা বলেন। এর প্রতিদানে তাকে দশ লাখ দিরহাম প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। যার মধ্যে পাঁচ লক্ষ দিরহাম নগদ প্রদান করেন এবং বাকি পাঁচ লক্ষ দিরহাম কুফায় প্রবেশের পর দেবেন বলে জানান।

ইমাম হাসানের দল ত্যাগ করে উবাইদুল্লাহ রাতের বেলা মুয়াবিয়ার দলে যোগ দেয়। যখন সকাল হলো তখন সৈন্যরা দেখল, তাদের দলনেতা নেই। অতঃপর তারা বিষয়টি বুঝতে পারল এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ল। এই সেনাদলের দ্বিতীয় সেনাপ্রধান ছিল কাইস বিন সাদ। কথা ছিল যদি উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস যুদ্ধে নিহত হয় তাহলে কাইস বিন সাদ দলকে পরিচালনা করবেন এবং জনগণের জন্য জামায়াত সহকারে নামায আদায় করবেন। তিনি দলের নেতা হিসেবে নিয়োগ হওয়ার পর সকল বিষয় উল্লেখ করে ইমাম হাসানের নিকট চিঠি প্রেরণ করলেন।

সর্বস্থানে অনৈক্য, বিক্ষিপ্ততা, দুর্বলতা এবং অবিশ্বস্ততা বিরাজ করছিল। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে অতি অল্প সংখ্যক লোক ছিল যারা প্রকৃতই আহলে বাইতের অনুসারী এবং ইমামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল।

মুয়াবিয়া ইমাম হাসান (আ.)-এর নিকট একটি চিঠি লিখে তাঁর নিকট সন্ধির আহ্বান জানায় এবং এ চিঠির সাথে ইমামের সঙ্গীরা মুয়াবিয়ার নিকট যে সকল চিঠি লিখেছিল–ইমামকে হত্যা করার ব্যাপারে অথবা তাঁর নিকট সমর্পণ করার ব্যাপারে–সকল চিঠি ইমামের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর দলে যারা যোগ দিয়েছে তাদের নামও ইমামের নিকট প্রেরণ করেন। এছাড়াও মুয়াবিয়া, ইমাম হাসানের সপক্ষে কিছু শর্ত দিয়ে সন্ধির জন্য আহ্বান জানান, যেন ইমাম এ সন্ধিতে রাজি হন। ইমাম হাসান (আ.) খুব ভালোভাবে জানতেন, মুয়াবিয়ার প্রতি কোন বিশ্বাস নেই এবং এগুলো সবকিছুই বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁকে হত্যা করার প্রাথমিক চিত্র। তবে তাঁর কিছু সাথির মৃত্যুর ঝুঁকি ও অন্যদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং মুয়াবিয়ার সাথে গোপন

সম্পর্ক স্থাপনসহ অন্যান্য বিষয়ে ষড়যন্ত্রের ফলে ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

সন্ধির শর্তাবলি

কিছুসংখ্যক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুয়াবিয়ার সঙ্গে ইমাম হাসানের সন্ধিচুক্তির শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ :

১. মুয়াবিয়া আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবেন এবং খলিফাদের পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

২. মুয়াবিয়া কোন ব্যক্তিকেই (খেলাফতের জন্য) নিজের উত্তরসূরি মনোনীত করতে পারবেন না। মুয়াবিয়া মারা গেলে খেলাফতের দায়িত্ব ইমাম হাসান (আ.) পালন করবেন এবং ইমাম হাসান (আ.) যদি ইন্তেকাল করেন, তাহলে খেলাফতের দায়িত্ব ইমাম হুসাইন (আ.) পালন করবেন।

৩. তিনি ইরাক, হেজাজ, ইয়েমেন অথবা অন্য যে কোন স্থানের সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা প্রদান করবেন এবং যে সকল ব্যক্তি মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেছে তাদেরকে গ্রেফতার অথবা তাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করবেন না।

৪. ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়াকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে সম্বোধন করবেন না।

৫. মিম্বারসমূহে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিবের ব্যাপারে কোন প্রকার গালমন্দ করা হবে না এবং তাঁকে সর্বদা উত্তম ভাবে স্মরণ করা হবে।

৬. ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করবেন না।

৭. প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ অধিকার দিতে হবে।

৮. মুয়াবিয়া শিয়া মাযহাবের সকল ব্যক্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এবং তাদের নামে কেউ খারাপ কথা রটাবে না।

৯. তিনি সিফফিন ও জামালের যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের সন্তানদের মধ্যে দশ লক্ষ দিরহাম বণ্টন করবেন এবং এগুলো দারাবজাদ থেকে প্রাপ্ত ভূমিকর হতে বরাদ্দ করবেন।

১০. মুয়াবিয়া কুফার বাইতুল মাল ইমাম হাসানের নিকট হস্তান্তর করবেন এবং তাঁর ঋণসমূহ তা থেকেই পরিশোধ করবেন। ইমাম হাসানকে প্রতি বছর এক লাখ দিরহাম প্রদান করবেন।

১১. ইমাম হাসান (আ.) ও তাঁর ভাই হযরত হুসাইন (আ.) এবং আহলে বাইতের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা অগোচরে কোন প্রকার চক্রান্ত ও প্রতারণা করা যাবে না এবং কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না। পৃথিবীর যে স্থানেই তাঁরা থাকুন না কেন, তিনি তাঁদেরকে ভয় দেখাতে পারবেন না।

মুয়াবিয়া এ সকল শর্ত স্বেচ্ছায় মেনে নেন এবং উল্লিখিত সকল বিষয় পালন করবেন বলে শপথ করেন।

যখন সন্ধির সম্পন্ন তখন মুয়াবিয়া কুফার নিকটবর্তী নুখাইলায় অবস্থান করছিলেন। দিনটি শুক্রবার হওয়ায় মুয়াবিয়া জনগণের উপস্থিতিতে জুমআর নামায আদায় করেন। মুয়াবিয়া জুমআর খুতবায় বলেন : 'আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের সাথে নামায আদায়, রোযা পালন, হজ পালন অথবা যাকাত দেওয়ার জন্য যুদ্ধ করি নি। এ কাজসমূহ আপনারা নিজেরাই পালন করবেন। আপনাদের উপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্থাপনের জন্য আমি যুদ্ধ করেছি। আল্লাহ তাআলা এটা আমাকে দান করেছেন। অথচ আপনারা এ বিষয়টি গ্রহণ করতে পারেন নি। আপনারা জেনে রাখেন, হাসান ইবনে আলী (আ.) আমার ওপর যে সকল শর্ত আরোপ করেছেন এবং তাঁকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ঐ প্রতিশ্রুতিগুলো এখন আমার পায়ের নিচে অবস্থান করছে এবং ঐ সকল ওয়াদা আমি রক্ষা করব না।' এরপর তিনি কুফায় এসে জনগণের নিকট হতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং মিম্বারে উঠে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ও ইমাম হাসানের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। ইমাম হুসাইন মুয়াবিয়ার বক্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। কিন্তু ইমাম হাসান (আ.) তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দেন ও নিজে উঠে সংক্ষিপ্ত খুতবা দেন এবং মুয়াবিয়ার ধৃষ্টতামূলক বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন।

সন্ধির কল্যাণ

মুয়াবিয়ার সাথে ইমাম হাসানের সন্ধিটি শত সমস্যা ও কষ্টের মাধ্যমে সম্পাদিত হলেও তার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো :

১. ইমাম হাসানের সন্ধির ফলে কারবালার বিপ্লবের ক্ষেত্র রক্ষা হয়েছে; যদি এ সন্ধি সম্পাদিত না হতো, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যুদ্ধের ময়দানে ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হুসাইন (আ.) দু'জনই শহীদ হতেন অথবা সিরিয়ার কুচক্রী মহল, মুনাফিক চক্র, দুনিয়াকামী গোষ্ঠী কিংবা খারিজী সেনারা তাঁদের দু'জনকে মুয়াবিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করত। কিন্তু সন্ধির ফলে ইমাম হাসানসহ তাঁর ভাই তথা কারবালা বিপ্লবের মহানায়ক ইমাম হুসাইন (আ.) সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁরা নিজের দায়িত্ব ও সমাজের নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হয়েছেন ও প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে নিজেদেরকে আরও শক্তিশালী করেছেন এবং কারবালা বিপ্লবকে অমর করে রেখেছেন। অবশেষে যদি সন্ধি না হতো, তাহলে স্বয়ং মুয়াবিয়া অথবা অন্য কেউ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের হেদায়েতের বাতিকে নিভিয়ে দিত এবং সকল কিছু অন্তর্হিত হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে এ সন্ধি আবু সুফিয়ানের বংশধরদের হুকুমতের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে নতুন করে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য সম্পাদিত হয়েছিল।

২. এ সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুয়াবিয়া এই স্থানের যোগ্য নন এবং ইমাম হাসান (আ.) পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কল্যাণের জন্য সন্ধি করেছেন; কারণ, সন্ধিচুক্তির শর্তসমূহের মধ্যে উল্লেখ ছিল, মুয়াবিয়াকে 'আমীরুল মুমিনীন' নামে ডাকা হবে না। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় মুয়াবিয়া এ পদের যোগ্য নন।

অথবা জুমআর নামাযের খুতবায় এবং অন্যান্য ইসলামি কেন্দ্রে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিব (আ.)-এর ব্যাপারে কোন প্রকার তিরস্কার করা যাবে না। এ বিষয়টিও মুয়াবিয়ার জন্য সামাজিক ব্যর্থতা হিসেবে

পরিগণিত; কারণ, এ থেকে প্রমাণিত হয়, মুয়াবিয়া ভুল পথে ছিলেন। মুয়াবিয়া অন্যায়ভাবে এবং শালীনতাবিবর্জিত এ কাজকে [তিরস্কারের প্রথা] প্রচলিত করেছিলেন। সন্ধিচুক্তির অন্যান্য শর্ত মুয়াবিয়ার কালো রাজনীতিকে স্পষ্ট করেছে এবং তাঁকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

৩. সন্ধির মাধ্যমে মুয়াবিয়ার খারাপ উদ্দেশ্য সঠিক রূপে জনগণের নিকট স্পষ্ট হয়েছে; কারণ, মুয়াবিয়া সন্ধিচুক্তির পর যে সকল অপরাধ করেছেন, বিশেষ করে ইমাম হসানকে হত্যা ও জনগণের ধনসম্পদ লুণ্ঠন। যদি যুদ্ধের সময় তা করতেন, তাহলে ও হয়তো বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলে ধরা যেত। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষরা এধরনের কাজ করে থাকে। কিন্তু সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর এসকল অপরাধকর্মে লিপ্ত হওয়ার কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এখানে সচেতন বিবেকবান ব্যক্তিরা বলেন, মুয়াবিয়া যদি খেলাফত চেয়ে থাকেন তাহলে তা পেয়েছেন। কিন্তু খেলাফত পাওয়ার পরেও কেন এত অত্যাচার, অপরাধ ও বিপর্যয় ঘটালেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইমাম হাসান (আ.) তাঁর সাথে সন্ধিচুক্তিতে রাজি হওয়া সত্ত্বেও কেন বেহেস্তের যুবকদের সর্দারকে হত্যা করেছেন? এখানে নিরপেক্ষ সত্যান্বেষীরা খুব ভালোভাবেই বিচার করতে পারবেন, মুয়াবিয়া ইসলামের মূল নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এর ফলে তিনি এধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন।

৪. মুয়াবিয়া সকল দিক থেকে সন্ধিচুক্তির আইন ভঙ্গ করেছিলেন; আর এ থেকেই তাঁর ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা প্রকাশ পায়। কারণ, তিনি শপথ করেছিলেন সন্ধিচুক্তির সকল শর্ত মেনে চলবেন। ঘটনাক্রমে প্রথম দিনই দম্ভের সাথে বলেন, 'এ সকল শর্ত আমার পায়ের নিচে অবস্থান করছে এবং কোন প্রতিশ্রুতিই আমি পালন করব না।'

এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামের শপথ করে কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তার বিপরীত পক্ষ অতি সাধারণ মানুষ হয় তাহলেও সে এত অল্প সময়ে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না এবং এভাবে নির্লজ্জের মত নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কথা বর্ণনা করবে না। অথচ মুয়াবিয়া সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন,

আর চুক্তিটিও ছিল বেহেশতে যুবকদের নেতা ও রাসূলের দৌহিত্রের সাথে! তাই তাঁর চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটিকে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

সুতরাং সন্ধিচুক্তি করার মাধ্যমে ইমাম হাসান (আ.) সামাজিক ও রাজনৈতিক সফলতা অর্জন করেছেন। অপরদিকে এর মাধ্যমে মুয়াবিয়ার প্রকৃত রূপ সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়।

(সংকলিত)

অনুবাদ : মোহাম্মাদ শামীম হুসাইন মীর্জা

জীবনী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (আ.)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাহ্ (আ.)

নূর হোসাইন মাজিদি

ইসলামের সকল মাযহাবের অভিন্ন 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী (যা সর্বসম্মত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবজাতির মধ্যকার চারজন শ্রেষ্ঠতমা মহিলার অন্যতম হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাহ্(আ.)। তিনি খাদীজাতুল কুবরাহ্ (মহীয়সী খাদীজাহ্) নামে সমধিক সুপরিচিতা।

ইসলামের বিকাশ-বিস্তারের জন্য যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁদের অন্যতম। কারণ, তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওপর ঈমান আনয়নকারী প্রথম ব্যক্তি। শুধু তা-ই নয়, তিনি তাঁর প্রভূত ধন-সম্পদের সবই ইসলামের খেদমতে ব্যয় করার জন্য হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে ইসলাম প্রচারের জন্যে হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর সম্পদের সহায়তা না হলে ইসলামের যাত্রাপথ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন হতো।

হস্তীবাহিনী সহ আবরাহা কর্তৃক মক্কাহ্ আক্রমণের ১৫ বছর আগে ৫৫৫ খৃস্টাব্দে এ পবিত্র নগরীতে হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর জন্ম। তাঁর পিতার নাম ছিলো খুওয়াইলিদ বিন আসাদ ও মাতার নাম ছিলো ফাতেমাহ্ বিন্‌তে যায়েদাহ্ বিন আছেম।

হযরত খাদীজাহ্(আ.) তৎকালে একজন মহীয়সী ও সচ্চরিত্রা ধনী মহিলা হিসেবে মক্কাহ্ নগরীতে সুপরিচিতা ছিলেন। তাঁকে বলা হতো খাদীজাতুত্ ত্বাহিরাহ্ (পবিত্রা/ সচ্চরিত্রা/ পূণ্যবতী খাদীজাহ্)। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বয়স যখন ২৫ বছর ও হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর বয়স ৪০ বছর তখন তাঁদের মধ্যে বিবাহ হয়।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পূর্বে হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর আরো দুই বার বিবাহ হয়েছিলো। তাঁর প্রথম বার বিবাহ হয় বানূ উসাইয়্যাদ গোত্রের আবূ হালাহ্

তামীমীর সাথে। আবূ হালাহ্‌র ঘরে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয় যার নাম ছিল হিন্দ্ বিন আবি হালাহ্। পরবর্তী কালে হিন্দ্ বিন আবি হালাহ্(আ.) হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাথে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি হযরত আলী (আ.)-এর সাথে জঙ্গে জামালে (উটের যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেন ও শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁর স্বামী আবূ হালাহ্‌র মৃত্যুর পরে মাখযূমী গোত্রের উতাইয়্যাক্ব বিন 'আয়েদ বিন আবদুল্লাহ্‌র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ স্বামীর ঘরে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম ছিল 'হিন্দ্ বিন্‌তে উতাইয়্যাক্ব'।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাথে বিবাহ

উতাইয়্যাক্বের মৃত্যুর পরে হযরত খাদীজাহ্(আ.) কিছুদিন একাকী জীবন যাপন করেন। তিনি ছিলেন একজন ধনবতী মহিলা। তিনি ব্যবসায়িক কাজে পুঁজি বিনিয়োগ করেন এবং অন্য লোকদের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করতেন, বিশেষ করে শামে (বৃহত্তর সিরিয়ায়) পণ্য পাঠাতেন। কিন্তু অনেক লোকই সততার পরিচয় দিতো না। এমতাবস্থায় তিনি হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর (তখনো তিনি নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হন নি) সততা ও উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে জানতে পেরে তাঁকে স্বীয় ব্যবসায়ের কাজে নিয়োগ করেন।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) হযরত খাদীজাহ্‌র (আ.) পণ্য নিয়ে শামে গমন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পরে যে হিসাব-নিকাশ দেন তাতে হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁর ধারণার চেয়েও অনেক বেশী লাভবান হন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমানতদারীর যে প্রতিফলন ঘটে হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাতে অভিভূত হন এবং পয়গাম-বাহকের মাধ্যমে তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। জবাবে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এ ব্যাপারে তাঁর অভিভাবক চাচা আবূ তালিবের সাথে যোগাযোগ করতে বললে হযরত খাদীজাহ্(আ.) পয়গাম-বাহককে আবূ তালিবের নিকট পাঠান।

আবূ তালিব হযরত খাদীজাহ্(আ.) সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই জানতেন এবং এ কারণেই তাঁর পূতচরিত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য পূণ্যবতী খাদীজাহ্‌র (আ.) বিবাহের প্রস্তাব এক বাক্যে মেনে নেন। অতঃপর যথাবিহিত উভয়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত রাসূলে আকরামের (সা.) সাথে বিবাহের পর হযরত খাদীজাহ্(আ.) আরো ২৫ বছর বেঁচে ছিলেন। নবীজীর (সা.) ঔরসে তাঁর ছয় জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ঃ দু'জন পুত্রসন্তান ও চার জন কন্যাসন্তান। তাঁদের দুই পুত্রসন্তানের নাম ছিলো হযরত আল-ক্বাসেম (আ.) ও হযরত আবদুল্লাহ (আ.), তাঁরা যথাক্রমে হযরত ত্বাহের (আ.) ও হযরত ত্বাইয়্যেব (আ.) নামেও পরিচিত। তাঁদের উভয়ই শৈশবে ইন্তেকাল করেন।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ঔরসে হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী চারজন কন্যাসন্তান ছিলেন ঃ হযরত যায়নাব (আ.), হযরত রুকাইয়াহ্(আ.), হযরত উম্মে কুলসূম (আ.) ও হযরত ফাতেমাহ্(আ.)। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন যথাসময়ে বিবাহিত হলেও নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ফাতেমাহ্(আ.)-এর মাধ্যমে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর বংশধারা অব্যাহত রয়েছে।

হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত ২৫ বছর হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। দু'জনের মধ্যে পনর বছর বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সুসম্পর্ক ছিলো প্রশ্নাতীত।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) হযরত খাদীজাহ্(আ.)-কে এতোই ভালবাসতেন যে, হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর জীবদ্দশায় তিনি আর কোনো বিবাহ করেন নি যদিও তাঁদের দাম্পত্য জীবনের শেষ দিকে হযরত খাদীজাহ্(আ.) ছিলেন বৃদ্ধা; ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বয়স ছিলো তখন ৫০ বছর।

ওয়াহী নাযিলের সূচনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) যখন হেরা গুহায় নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর এ নতুন অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বভারের চাপে মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন তখন হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁকে শক্তি ও সাহস যোগান।

হেরা গুহায় হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) সশরীরে আবির্ভূত হয়ে তাঁর নিকট আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহী (সূরাহ্ আল-'আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত) নাযিল করে চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসেন। তিনি হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর নিকট সব বিষয় খুলে বলেন।

হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁর স্বামীর উত্তম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাথে পুরোপুরি পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সত্যবাদিতার ওপর গভীর আস্থা পোষণ করতেন। তাই তিনি হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)কে উৎসাহ দিলেন ও তাঁর সাফল্য সম্পর্কে দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর নবুওয়াতের ওপর ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। আর তিনিই হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনয়নকারী প্রথম ব্যক্তি।

বস্তুতঃ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্য করার বিষয় যে, গোটা মানবজাতির মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত খাদীজাহ্(আ.)। তিনিই হলেন প্রথম মুসলমান। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৫৫ বছর।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর নিকট প্রথম বার ওয়াহী নাযিল হবার পর কয়েক দিন, মতান্তরে কয়েক মাস, ওয়াহী নাযিল বন্ধ থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন আবার জিবরাঈল (আঃ)কে দেখতে পেলেন। এ সময় জিবরাঈল (আঃ) একটি ভাসমান আসনে বসে আকাশে উড়ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘরে চলে গেলেন। তিনি তাঁকে ঢেকে দেয়ার জন্যে হযরত খাদীজাহ্কে (আ.) অনুরোধ জানালেন। হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিট পরই হযরত খাদীজাহ্(আ.) দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কেঁপে কেঁপে উঠছেন, বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন এবং ঘামছেন। এ সময় জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট দ্বিতীয় ওয়াহী নিয়ে এলেন। এতে বলা হয় ঃ "হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! উঠুন এবং (লোকদেরকে) সতর্ক করুন। আপনার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। আর আপনার পোশাককে পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। আর অধিক প্রতিদানের আশায় দান করবেন না এবং আপন রবের ওয়াস্তে ছবর করুন।" (সূরাহ্ আল-মুদ্দাছ্ছির্ ঃ ১-৭)

হযরত খাদীজাহ্ (আ.) হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর অবস্থা দেখে তাঁকে আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ "হে খাদীজাহ্! আমার তন্দ্রা ও বিশ্রামের যুগ অতীত হয়ে গেছে। জিবরাঈল আমাকে লোকদেরকে সতর্ক করতে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর 'ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে বলেছেন। কিন্তু আমি কা'দেরকে দাওয়াত করবো? কে আমার কথা শুনবে?"

হযরত খাদীজাহ্ (আ.)-এর ইসলাম গ্রহণ মক্কাহ্বাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে খুবই সহায়ক হয়। তিনি সব সময়ই হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)কে সহায়তা প্রদান করেন। বিপদের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে সাহস যোগান ও সান্ত্বনা দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে সাধ্যমতো সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করেন।

হযরত খাদীজাহ্(আ.) তাঁর ধন-সম্পদ ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেন। শুধু তা-ই নয়, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) সব সময় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন বিধায় সাংসারিক কাজে যথেষ্ট সময় দিতে পারতেন না। এমতাবস্থায় হযরত খাদীজাহ্(আ.)ই তাঁদের সন্তানদের দেখাশোনা ও অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম করতেন।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও হযরত খাদীজাহ্(আ.)কে বিভিন্ন সময় বহু দুঃখ-বেদনা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁদের দুই প্রিয় পুত্র হযরত ক্বাসেম (আ.) ও হযরত আবদুল্লাহ্(আ.) শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পঞ্চম বছরে তাঁদের কন্যা হযরত রুকাইয়াহ্(আ.) তাঁর স্বামী হযরত উসমান বিন 'আফ্ফান (আ.)-এর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তখন হযরত রুকাইয়াহ (আ.)-এর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। কিন্তু ইসলামের খাতিরে এ বয়সেই তাঁকে পিতা-মাতার নিকট থেকে দূরে চলে যেতে হয়। (অবশ্য চার বছর পর তাঁরা ফিরে আসেন।) এভাবে স্বীয় সন্তান থেকে এ দীর্ঘ বিচ্ছেদ হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর জন্যে খুবই বেদনাদায়ক ছিলো।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবার পর ক্বোরাইশ গোত্রের কাফের নেতারা তাঁকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য যারপরনাই চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর ভূমিকা ছিলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একদিকে যেমন

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে সান্ত্বনা দেন ও সাহস যোগান, অন্যদিকে তাঁর আর্থিক সহায়তা ইসলাম প্রচারে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়।

এরপর মক্কাহ্ নগরীর কাফেররা যখন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট আরোপ করে তখন তাঁদের সকলকে শে'বে আবি তালিব নামক গিরিখাতে আশ্রয় নিতে হয়। এখানে তাঁদেরকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দীর্ঘ তিন বছর অবস্থান করতে হয়। তখন হযরত খাদীজাহ্(আ.) ইসলামের তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাথে শে'বে আবি তালিবের দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেন।

ইন্তেকাল

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুসলিম মহীয়সী মহিলা হযরত খাদীজাহ্(আ.) হযরত নবী করীম (সা.)-এর নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবার পরবর্তী দশম বছরে (৬২০ খৃস্টাব্দে) ১০ই রামাযান, মতান্তরে ২০শে রামাযান তারিখে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর।

হযরত খাদীজাহ্ ত্বাহেরাহ্(আ.)-এর ইন্তেকাল হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর জন্য একটি বিরাট আঘাত ছিলো।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) হযরত খাদীজাহ্(আ.)কে এতোই ভালবাসতেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করতেন।

হযরত খাদীজাহ্ ত্বাহেরাহ্(আ.) ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতমা চারজন মহিলার অন্যতম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নিয়মিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তাঁর জন্যে সালাম নিয়ে আসতেন।

হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর ইন্তেকালে তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমাহ্(আ.) খুবই মর্মাহত হন। এর পর থেকে তিনি সব সময়ই পিতার কাছে থাকতেন এবং প্রায়ই মায়ের জন্যে অশ্রু বিসর্জন দিতেন ও বলতেন ঃ "কোথায় আমার মা? কোথায় আমার মা?" হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাদীজাহ্কে (আ.) জান্নাতে স্থান দিয়েছেন।

মুসলিম নারীদের জন্যে হযরত খাদীজাতুল্ কুবরাহ্(আ.) এক অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি তাঁর স্বামী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ছিলেন খুবই আন্তরিক। এছাড়া তিনি আল্লাহ্র পথে বহু চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন যার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল ও ব্যতিক্রম। হযরত খাদীজাহ্(আ.)-এর ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া ইসলামের অগ্রযাত্রা সহজ হতো না।

তথ্যসূত্র ঃ

১. تاریخ پیامبراسلام: دکتر محمد ابراهیم آیتی، موسسهی انتشارات و چاپدانشگاه تهران، ١٣٦٦هش (١٩٨٧م).

২. مجموعه زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام : عماد الدین حسین اصفهانی معروف به عماد زاده، نشر طلوع، تهران، چاپ هشتم، ١٣٦٤هش (١٩٨٥م).

৩. الاعلام قاموستراجمل خیرالدین الزرکلی، دارالعلم للملایین، بیروت، لبنان، ١٩٨٩م.

৪. دایرة المعارف الاسلامیة للمستشرقین، المجلد الثامن، دار المعرفة، بیروت، لبنان.

৫. اسد الغابة فی معرفة الصحابة : العز الدین بن الاثیر ابن الحسن علی بن محمد الجزری، الجزء السادس، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ١٤٠٩هـ (١٩٨٩م)، رقم ٦٨٦٧.

৬. Islam: Beliefs and Teachings by Prof. Ghulam Sarwar, The Muslim Educational Trust, 130, Stroud Green Road, London.

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী

মূল : মুহাম্মাদ আলী চানারানী

আবান ইবনে আস

সাদ ইবনে আস এর ছেলে আবান ছিলেন বনি উম্যাইয়া গোত্রের। যদি বনি হাশিমের প্রতি বনি উমাইয়্যার শত্রুতা ও হিংসা কারো নিকট গোপন ছিল না, কিন্তু এই পরিবার থেকে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মের পথে সংগ্রাম করেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে আবান অন্যতম। আবান তাঁর পিতার বিশ্বাসের প্রভাবাধীন ছিলেন এবং তাকে ভয় পেতেন। তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। কিন্তু একটি ঘটনা তাঁকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং তাঁর জীবনের একটি নতুন পথ খুলে দেয়।

সিরিয়ায় তার একটি বাণিজ্য সফরে আবান একজন খ্রিস্টান পাদ্রির সাক্ষাৎ করেন যিনি পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের বই পাঠ করেছিলেন এবং .....। আবান সেই পাদ্রিকে কবলেন, কুরাইশ গোত্র থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি নিজেকে আল্লাহর নবি বলে দাবি করছেন। তিনি বলেন যে, তিনি মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর মতোই আল্লাহর নবি। পাদ্রি আবানকে জিজ্ঞেস করেন, এই লোকটির নাম কী?' আবান উত্তরে বলেন, তাঁর নাম মুহাম্মাদ। পাদ্রি বলেন, আমি তোমার কাছে আল্লাহর শেষ নবির বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন বর্ণনা করব। যদি এই ব্যক্তির এর কোন একটি নিদর্শন থাকে তাহলে নিশ্চিত জানবে যে, নিশ্চয়ই তিনি ওই নবি যার আগমন সম্পর্কে ভালো টাইডিং দেয়া হয়েছে। এরপর পাদ্রি আল্লাহর শেষ নবির সকল নিদর্শন বর্ণনা করলেন। আবান বললেন, 'আপনি যেসব নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তার সবই এই ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে।' পাদ্রি বললেন, 'তিনি সকল আরবের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন।'

তাঁর ধর্ম পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত হবে। তারপর সেই খ্রিস্টান পাদ্রি বলেন, 'তাঁর কাছে আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও যখন তুমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবে।- উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬

হ্যাঁ, একটি আত্মা যা রূপান্তর হওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন তার জন্য প্রয়োজন একটি স্ফুলিঙ্গ যা তার মধ্যে বিপ্লবের যে আলো আছে তা জ্বালাবে। এই কারণেই এই আলোচনা। এই সাক্ষাৎকার আবানের আত্মার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এরপর থেকে আবান সেই যুবক আর থাকল না যেমনটি সে পূর্বে ছিল। বিপরীত দিকে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে একত্ববাদী অগ্রদূত মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দিকে একটি রহস্যজনক টান অনুভব করতে থাকেন।

এই পথে তাঁর একমাত্র প্রতিবন্ধক তাঁর পিতা তায়েফের একটি স্থান যারিবাহায় মৃত্যুবরণ করে। আবান এখন তাঁর ব্যাপারে স্বাধীন হয়ে গেলেন, তিনি যা খুশি করতে পারেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদের ব্যঙ্গ করে যেসব কবিতা রচনা করেন এবং যেসব কথা উচ্চারণ করতেন তা বন্ধ করে দেন।

তাঁর ভাই খালিদ ইবনে আবান, যিনি ইথিওপিয়ায় মুসলমানদের সাথে হিজরত করেছিলেন, ষষ্ঠ হিজরিতে মদিনায় ফিরে আসেন। যখন তাঁরা আবানের আধ্যাত্মিক বিপ্লব সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তাঁরা একটি চিঠির মাধ্যমে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। আবান তাঁর আহ্বানে খুশিমনে সাড়া দেন। তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং খায়বার যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে যোগ দেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়কাল লিখেছেন ৭ম হিজরিতে।

আবান– একজন সেনা ও একজন পণ্ডিত

ইসলাম গ্রহণের পর আবান তাঁর স্বাভাবিক যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের মাধ্যমে। যখন মহানবী (সা.) আবানের অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি আবানকে নাজদে অবস্থানগ্রহণকারী একটি দলকে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন যারা সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করেছিল।

আবান কেবল একজন যোদ্ধাই ছিলেন না; বরং বুদ্ধিমত্তা ও মহান স্যাগাসিটি সম্পন্ন ছিলেন।

তিনি নানা ধরনের প্রতিভা ও সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, এমন যোগ্যতা ও সক্ষমতা যা মহানবীর অল্প সংখ্যক সাহাবীরই ছিল।

আবানের অন্যতম অমূল্য প্রতিভা ছিল যে, তিনি পড়তে ও লিখতে পারতেন। সাক্ষরতা সেই সময় ছিল বিরল এবং খুবই মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হতো। যখন মহানবী (সা.) মক্কায় তাঁর নবুওয়াতি মিশন শুরু করেন তখন শিক্ষিত বা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা সতের এর বেশি ছিল না। তাঁদের একজন ছিলে আবান।– ফুতুহ আল বুলদান, পৃ. ৪৫৯

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর একজন ওহী লেখকে পরিণত হন।

বাহরাইনের গভর্নর

যখন ইসলাম প্রসারিত হচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) সতর্ক নির্বাচনের পর গভর্নরদেরকে বিভিন্ন শহরে পাঠাতেন। উত্তম চরিত্র ও আচরণের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে তিনি নির্বাচন করতেন ইসলামের ঐশী পিসেপ্ট অনুসারে, যাতে তাঁরা নব মুসলমানদের জন্য আদর্শে পরিণত হতে পারেন। এটি এ কারণে যে, এই সংখ্যালঘু ব্যক্তিত্বদের ছোটখাটো বিচ্যুতিও উপেক্ষা ও ক্ষমা করা যেতে পারে না।

মহানবী (সা.) আলা ইবনে হাদরামীকে বাহরাইনের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন, যেটি ইসলামের অধীনে আসে। কিন্তু কিছুদিন পর মহানবী (সা.) আলা ইবনে হাদরামীকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং আবানকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। মহানবী (সা.)-এর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

মহানবীর ওফাতের পর তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গভর্নরের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁকে অনুরোধ করা হলেও তিনি আর সেই পদে যোগ দেন নি।

আবান একজন স্বাধীনচেতা মুসলিম ছিলেন যিনি এই পদ গ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি মহানবী (সা.) কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন।

আবান তাঁর ভাই খালিদের সাথে বনি হাশিমের গৃহে যেতেন এবং বলতেন : আপনার বনি হাশিম ওহীর উর্বর বাগান এবং নবুওয়াতি মিশনের উচ্চ বৃক্ষ; যে বৃক্ষ তার

শাখায় পবিত্র ফল ফলায়। আমরা আপনাদের আদেশ মান্য করব এবং আপনাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করব,

আপনারা যাকে সর্বোত্তম বলে গণ্য করেন আমরা তাকে সর্বোত্তম গণ করব এবং আপনারা যাকে অগ্রাধিকার দেন আমরা তাদেরকে অগ্রাধিকার দেব। ১ উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬

আল্লাহর রাসূলের বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর আবান হিসেবে কাজ করেন। যতদিন না তিনি ১২ হিজরিতে রজব মাসে সিরিয়ার ইয়ারমুক নামক স্থানে বিষযুক্ত ফলের রস পানে শহীদ হন। তাঁকে সেখানে সমাহিত করা হয়। উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭

উবাই ইবনে কাব

উবাই ইবনে কাব ছিলেন খাযরাজ– যারা আগে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বসবাস করত। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি একজন ইহুদি পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তিনি একত্রিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাওরাতের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন এবং মহানবী (সা.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জানতেন। যখন প্রথম মুসলিম প্রচারক মুসআব ইবনে উমাইর মদীনায় প্রবেশ করেন এবং জনগণকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, উবাই ইবনে কাব স্পষ্ট দূরদৃষ্টি সহকারে এবং সম্পূর্ণ সচেতনতার সাথে সাড়া দেন, এমনকি মহানবী (সা.)- কে দেখার পূর্বেই। আকাবার ২য় বাইআতে মদীনায় যে সত্তরজন মুসলিম বাইআত করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি মদীনার সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতেন। সে কারণে তিনি মুসলমানদের মধ্যে অল্প সময়েই মহা সফলতা অর্জন করেন। যখন মহানবী (সা.) মদীনায় প্রবেশ করেন তখন উবাই বিন কাব ছিলেন আনসারদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি ওহী লেখক হিসেবে কাজ করেন এবং মহিমান্বিত কোরআনের অন্যতম .... পরিণত হন।

বুদ্ধিদীপ্ত যোগ্যতার সাহায্যে উবাই শীঘ্রই মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি ...

মহিমান্বিত কোরআন তেলাওয়াতের দক্ষতা অর্জন করেন এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেন।

এটি উল্লেখ করা জরুরি যে, এই সম্মানজনক অবস্থা ও মর্যাদা তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল মহান আল্লাহ কর্তৃক। মহানবী (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে উবাইয়ের জন্য কোরআন তেলাওয়াত এবং সঠিক ও শুদ্ধভাবে কীভাবে কোরআন পাঠ করতে হয় তার শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ লাভ করেন। উবাই কখনও চিন্তা করেন নি যে, যেদিন তিনি আল্লাহ কর্তৃক .....

যখন মহানবী (সা.) তাঁকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আল্লাহ তাঁকে কোরআন তেলাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করেছেন তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আল্লাহ কি আমার নাম ধরে একথা বলেছেন? মহানবী (সা.) জবাব দিয়েছিলেন : হ্যাঁ, তিনি তোমার নাম ধরে তা বলেছেন। তিনি এই সম্মানের জন্য এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন, তাঁর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মহানবী (সা.) তাঁকে শান্ত করার জন্য পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন : ১০ :৫৭

উবাই সবসময় তাঁর শিক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক চলতেন।

একজন নবীকে উবাই ইবনে কাব বলেন, ‘ হে রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহয় বিশ্বাস করেছি এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আপনার হাতে, এরপর আপনার কাছ থেকে কোরআন শিক্ষা করেছি।- হিলওয়াতুল আওলিয়া

উবাই সবসময় যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করার কারণে এক মহান উচ্চতায় পৌঁছান। ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : ‘আমরা (আহলে বাইত) উবাইয়ের কোরআন পাঠ অনুসারে কোরআন তেলাওয়াত করি। -দারাজাত আর রাফিয়াহ, পৃ. ৩২৪

উবাই ইবনে কাব ও কোরআনের শিক্ষা

যা উল্লেখ করা হয়েছে তার অতিরিক্ত উবাইয়ের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। উবাইয়ের অন্যতম বিশেষ যোগ্যতা ছিল পবিত্র কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান।

উবাইয়ের একটি জিজ্ঞাসু মন ছিল, একটি খোলামেলা অভিব্যক্তি এবং কোরআন অধ্যয়ন সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা । এটি এ কারণে যে, তিনি সবসময় একাডেমিক

গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সবসময় পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের বিষয়কে বিস্তারিতভাবে সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করতেন।

এজন্যই মহানবী (সা.) সবসময় তাঁকে ঐশী জ্ঞান অর্জনে কঠোর সংগ্রামে উৎসাহিত করতেন।

এক ব্যক্তি উবাই ইবনে কাবকে উপদেশ দেয়ার জন্য বললে তিনি বলেন, তোমার পথপ্রদর্শক, দৃষ্টান্ত এবং বিচারক হওয়া উচিত পবিত্র কোরআন, কারণ, এটি মহান আল্লাহর মহানবীর থেকে স্মরণ এবং .....। এটি মুসলমানদের নিত্য কর্মকাণ্ডের সূচি এবং বৈষম্য থেকে দূরে।

অতীতকালের লোকজনের জীবন সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেখানে মুসলমানদের জীবনের সঠিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। বর্তমান মুসলমানদের এবং প্রজন্মদের পরবর্তীতে যারা আসবে তাদের ভবিষ্যৎ খবর এর মধ্যে রয়েছে।

উবাই এবং নবী (সা.)-এর ওফাতের পরে সংঘটিত ঘটনা

সকীফার দিন বিকাল বেলা আনসারদের একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন আনসার জিজ্ঞেস করলেন : উবাই! আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি জবাব দিলেন : রাসূলের পরিবারের গৃহ থেকে। তারা জিজ্ঞেস করলেন : নবীর পরিবারের অবস্থান কেমন? তিনি বললেন : একজন কিভাবে তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে পারে যাদের ঘর আজ এমন একজন থেকে শূন্য যাঁর কাছে আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর বাণী নিয়ে আগমন করতেন? যখন তিনি একথা বললেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাঁর কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এটি দেখে তাঁকে যেসব লোক এসব প্রশ্ন করেছিলেন তাঁরাও কান্না শুরু করেন।– আদ দারাজাত আর রাফিয়াহ, পৃ. ৩২৫

তিনি ৩০/৩২ হিজরিতে ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। উবাই একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামের নীতিকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সংগ্রাম করেন যে শিক্ষা তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। কিনউত যে পথে ইসলাম অগ্রসর হচ্ছিল তাতে তিনি ভঙ্গ হৃদয়ে ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

আবু কাতাদাহ আনসারী

আবু কাতাদার পুরো নাম হারিস ইবনে রাবি আনসারী। ইসলামের ইতিহাসে তিনি আবু কাতাদা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইতিহাসের পণ্ডিতদের মতে, আবু কাতাদা ছিলেন রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা সাহাবী। তিনি আল্লাহর জন্য এবং ইসলামের অগ্রগতির জন্য সবসময় সাহসিকতার সাথে নিজ জীবনের ঝুঁকি নিতেন।

আবু কাতাদা একজন বীর অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মহানবীর জীবদ্দশায় অন্যান্য যুদ্ধে তিনি মহানবীর পাশে থেকে যুদ্ধ করেন এভাবে যে, তিনি মহানবীর আর্টিলারির সেনাপতি হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। তিনি এমন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন যে, তাঁকে যে বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হতো তা তিনি সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতেন এবং বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতেন। যি কাদরের যুদ্ধে আবু কাতাদা অংশগ্রহণ করেন, যা বনি গাতফানের বসতির লাগায়ো মদীনার সন্নিকটে। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়। আবু কাতাদা মহানবীর কাছে এসে স্বেচ্ছায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নাম লেখান। সেসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ বছর, হিজরতের আঠারো বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেন।

আবু কাতাদা সাহসী যোদ্ধা যদিও যুবক, ইবনে উয়াইয়ানাকে হত্যা করেন; যে বিপক্ষ দলের নেতা ছিল। তারপর তিনি সেই কাফেরের মৃতদেহকে নিজের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। যারা ওই পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিল তারা এটি দেখে মনে করেছিল যে, আবু কাতাদা মারা গেছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে আবু কাতাদার অবস্থা জানিয়ে দেন।

এই যুদ্ধে দুইজন শহীদ হওয়ার পর মুসলমানরা কাফের গোত্র গাতফানকে পরাজিত করে এবং বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। আবু কাতাদা আর যেসব মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দেন ইসলামের জন্য তা হলো তিনি খায়বরের বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। অন্য সকল খাঁটি মুসলমানের মতো নবীর প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। এটি এ কারণে যে, তিনি সবসময় মহানবীর সাথে সম্মানপূর্বক আচরণ করতেন।

মহানবীও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এ কারণে মহানবী (সা.) তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন : আল্লাহ তোমাকে সেভাবে প্রতিরক্ষা করুন যেভাবে তুমি নবীকে বিপদাপদ থেকে প্রতিরক্ষা করেছ।

হযরত আলীর পাশে

মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি হযরত আলী (আ.)-এর খেলাফতের সময় দৃঢ়ভাবে হযরত আলীকে সমর্থন করেন। তিনি কেবল একজন যোদ্ধাই ছিলেন না, একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক ও সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী ব্যক্তিও ছিলেন। হযরত আলী খেলাফতকালে তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন।

তিনি হযরত আলীর পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং এর পাশাপাশি তাঁর সপক্ষে জনগণের সামনে বক্তব্য রাখতেন। তিনি যৌক্তিকভাবে হযরত আলীর অধিকার বর্ণনা করতেন।

আবু কাতাদা ৫৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তবে কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেছেন, তিনি হযরত আলীর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি তাঁর জানাযা পড়ান ও কবরস্থ করেন।– আল ইসাবাহ,

বিলাল হাবাসী

ইথিওপিয়ার অধিবাসী বিলাল বিন রিবাহ এর প্রকৃত নাম ছিল আবু আবদিল্লাহ। যখন মহানবী (সা.) তাঁর নবুওয়াতের মিশন শুরু করেন তখন তিনি মক্কায় দাস হিসেবে জীবন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম হামামাহ এবং তিনি বনি যুমাহ গ্রামে বাস করতেন। বিলাল ইসলামের ঐশী আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করেন এবং এরপর থেকে অনবরত মক্কার কাফিরদের ও মূর্তিপূজকদের কাছ থেকে নির্যাতন ভোগ করতে থাকেন। প্রসিদ্ধ ধারণা অনুযায়ী তিনি উমাইয়্যা ইবনে খালাফের দাস ছিলেন এবং তার বাড়িতেই বাস করতেন।

উমাইয়্যা বিলালকে রৌদ্রতপ্ত দিনে বিলালকে ঘর থেকে বের করে আনত এবং মক্কার উত্তপ্ত নুড়ি-পাথরের ওপর শুইয়ে রাখত। এরপর সে বিলালের বুকের ওপর একটি প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়ে দিত। তারপর সে বলত, 'প্রভুর শপথ করে বলছি, তুই ততক্ষণ এভাবে থাকবি যতক্ষণ না তোর মৃত্যু হয় অথবা তুই মুহাম্মাদের আল্লাহকে অস্বীকার করে লাত ও উযযার উপাসনা না করবি। কিন্তু যখনই প্রতিরোধ ও ধৈর্যের এই

'মডেল' এরূপ অবস্থায় পড়তেন তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলতে, 'আহাদ, আহাদ' অর্থাৎ এক, এক। অর্থাৎ তাঁর প্রভু আল্লাহ এক, তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

অনেক ইতিহাসবিদ বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি বিলালকে অত্যাচার করত সে ছিল আবু জাহল। বিলাল এই অসহনীয় অত্যাচার ও কঠিন অবস্থার মধ্যে ততদিন ছিলেন যতদিন না মহানবী (সা.) তাঁকে খরিদ করে নেন এবং আল্লাহর খাতিরে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।

তাঁরা বলেন, একদি মহানবী (সা.) আবু বকরকে বলেন, 'যদি আমার কাছে কিছু থাকত যাতে বিলালকে কিনতে পারি তাহলে তাই করতাম।' একথা শুনে আবু বকর আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের কাছে যান এবং মহানবীর কথা তাঁর সামনে উপস্থাপন করেন। রাসূলের চাচা আব্বাস বিলালের মালিকের কাছ থেকে তাঁকে ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন।

বিলাল ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুয়াজ্জিন। রাসূলের ওফাতের পর বিলাল ও আরো কিছুসংখ্যক লোক মদীনা ত্যাগ করেন এবং সিরিয়ায় চলে যান। সেখানে তিনি ২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

বিলাল ছিলেন..... যুবক যিনি ধৈর্যের সাথে তাঁর পথে আসা সকল কঠিন অবস্থাকে বহন করেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে অস্বীকার করেন নি। বিলাল ছিলেন রাসূলের অনুগত ও বিশ্বস্ত সাহাবীদের অন্যতম যিনি রাসূল (সা.)-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বারা ইবনে আযিব

বাররা ইবনে আযিব নবী (সা.)-এর সম্মানিত সাহাবী, হাদিসের একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী, একজন বীর যোদ্ধা, একজন আনসার সাহাবী এবং মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতাও নবী (সা.)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন।

বাররা নবুওয়াতের মিশনের ২য় বছরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তের বছর বয়সে

ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেন। নবী (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন বাররা প্রায়ই মহানবীর কাছে যেতেন।

বাররা পবিত্র কোরআনের কয়েটি বড় সূরা মুখস্থ করেন এবং রাসূলের একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী বলে গণ্য হতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি

ইসলামের কোলে প্রতিপালিত এবং আধ্যাত্মিকভাবে উদ্দীপ্ত বাররা ছিলেন .....। তিনি গভীরভাবে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এমনভাবে যে, তিনি স্বেচ্ছায় যুদ্ধের জন্য নাম লেখান এবং পনের বছর বয়সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেন। নবী (সা.) তাঁকে কম বয়সের কারণে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দেন নি। যদিও তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পান নি, কিন্তু চৌদ্দটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলের সাথে আঠারোটি সফরে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং ইসলামের প্রতিরক্ষায় সকল ধরনের কষ্ট সহ্য করেন। রাসূলের ওফাতের পর তিনি রেই, আবার এবং কাযভীন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এটি অনেক ঐতিহাসিক দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে।– উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫

বাররা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর পরিবারকে খুবই ভালোবাসতেন। যখন হযরত আলী মদীনা থেকে কুফায় চলে যান তখন বাররাও তাঁর আবাস পরিবর্তন করে কুফায় চলে যান এবং আলী (আ.)-এর বাড়ির পাশে বসতি গড়েন। তিনি হযরত আলীর সাথে জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফ্ফিন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস বর্ণনা

হযরত বাররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক হাদিস বর্ণনা করেন। এসব হাদিসের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'গাদীরে খুম' এর হাদিস।

ইবনে জাওযী বলেন, বাররা ইবনে আযিব স্মরণ করেন, গাদীর দিবসে দুপুরের নামাযের আযান দেয়া হলো। মহানবী (সা.) নামাযের ইমামতি করেন। নামাযের পর তিনি হযরত আলীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ঘোষণা করেন : আমি যার মাওলা এবং পথপ্রদর্শক, এই আলী তার মাওলা ও পথপ্রদর্শক।'

এই মনোনয়নের ঘোষণার পর তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উমর হযরত আলীকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আসলেন এবং বললেন : 'আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি হে আবু তালিবের পুত্র! আজ থেকে আপনি সকল মুসলিম নর ও নারীর নেতা ও ইমাম হয়ে গেলেন।'

হযরত বাররা হাদিসে গাদীরের অন্যতম বর্ণনাকারী। মহানবীর ওফাতের পর তিনি অন্যান্য মুসলমানদের থেকে ভিন্নধর্মী আচরণ করেন। অনেকে বলেছেন যে, যেহেতু তিনি গাদীরে খুমের ঘটনার সাক্ষী ছিলেন সেজন্য তিনি ভিন্ন আচরণ করে থাকবেন।

হযরত বাররা ৭২ হিজরিতে কুফায় ইন্তেকাল করেন।

খালিদ ইবনে সাইদ

খালিদ ইবনে সাইদ উম্যাইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পবিত্র কোরআনে এই পরিবারকে 'শয়তানের বৃক্ষ' বলা হয়েছে। সাইদ ইবনে আস ছিল এই গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি যে ইসলামের অন্যতম প্রধান ও প্রভাবশালী শত্রু ছিল। সে ছিল মক্কার মূর্তিপূজকদের অন্যতম বড় পৃষ্ঠপোষক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ইসলামের বিরোধীতা করে এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়।

সাইদের তিন পুত্রসন্তান ছিল। তাঁদের নাম হলো আবান, খালিদ ও আম্‌র। সাইদ কখনোই ধারণা করে নি যে, তার সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করবেন, কিন্তু তার তিন সন্তানই পর্যায়ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তাঁদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন খালিদ।

হযরত খালিদ ছিলেন প্রথমদিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। কিছুসংখ্যক ইতিহাসবিদ বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন, কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি। আমরা বলতে পারি যে, একটি তিতা ফল উৎপন্নকারী গাছও সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন করতে পারে, যার উদাহরণ হলেন খালিদ ইবনে সাইদ। কারণ, এমন একজন চমৎকার ও অমূল্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন অবিশ্বাসী ও মূর্তিপূজক পিতার ঘরে।

ইতিহাসবিদগণ তাঁকে প্রথম দিকের মুসলমান হিসেবে বর্ণনা করেছেন।- তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৫, উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২

একটি ভাগ্যনির্ধারণী স্বপ্ন

প্রতিটি মানুষের জীবন সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে; যদি সে সেই অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তা লাভজনক হয় এবং কাঙ্ক্ষিত ফল দেয়। কখনো এই বিষয়গুলো প্রকাশিত হয় একটি স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা অন্তর্জগতে কোন কিছু নিদর্শন বোঝার মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে তা বাস্তব সুস্পষ্ট ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মানুষের এই অন্তর্নিহিত বিষয়কে উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ এটি মানুষকে তাদের গন্তব্যে পথনির্দেশ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খালিদের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার প্রকৃতিও এরূপই ছিল। কারণ, এটি তাঁকে পার্থিব ও চিরস্থায়ী উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। যখন মহানবী (সা.) ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ব্যক্তিকে ইসলামে দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন এবং খুব বেশি সংখ্যক মানুষ ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি সেই সময় খালিদ একদিন স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটি বড় ও বিপজ্জনক আগ্নেয়গিরির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন। আগুনের ফুলকি নিচ থেকে ওপরে উঠছিল। আর তাঁর পিতা তাঁকে সেই আগুনে ফেলার জন্য চেষ্টা করছিল। মহানবী (সা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খালিদকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন এবং তাঁকে সেই আগুনে পতিত হতে রক্ষা করছেন।

খালিদ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং বললেন : 'আমি আল্লাহর শপথ করছি যে, এই স্বপ্ন সত্য ও সঠিক। পরবর্তী দিন সকালে তিনি হযরত আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। হযরত আবু বকর বললেন : 'তোমার স্বপ্ন ভবিষ্যতের সুখবর বহন করছে। তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো মহানবী (সা.) তোমাকে আগুনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছেন, কারন, তুমি তাঁর ঐশী আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দেবে ও তাঁকে অনুসরণ করতে চলছ, যেখানে তোমার পিতা অবিশ্বাসী ও মূর্তিপূজকই রয়ে যাবে।'

এই কথোপকথনের পর হযরত বাররা দ্রুত মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে যান এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন : 'হে মুহাম্মাদ! আপনি মানুষকে কিসের প্রতি আহ্বান করছেন এবং আপনার ধর্ম কী?' রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন : 'আমি মানুষকে আমার নবুওয়াতের মিশনকে স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানাই এবং তাদেরকে মূর্তিগুলোর পূজা হতে নিষেধ করি। কারণ, সেগুলো শুনতে ও দেখতে পারে না, মানুষের উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না।'

খালিদ এ কথায় ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং মহানবী (সা.)-এর শক্তিশালী ও দৃঢ় যুক্তিতে উদ্বুদ্ধ হন, কারণ, তখন তিনি তাঁর স্বপ্নের একটি অর্থ খুঁজে পান। তিনি সর্বান্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমাইয়্যা গোত্রের এক যুবক ইসলাম গ্রহণ করায় মহানবী (সা.) খুব খুশী হন।

যখন খালিদের পিতা এ ব্যাপারে জানতে পারল তখন সে তার অন্যান্য সন্তান ও দাসকে ডাকল। ক্রোধে দাঁত দাঁতে ঘষে ও থুথু ফেলে তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন যেন খালিদকে তারা ধরে নিয়ে আসে। তারা খালিদের খোঁজে বাইরে গেল এবং তাকে খুঁজে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসল। খালিদ ও তার পিতার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি খুবই চমকপ্রদ ছিল। যখন খালিদের পিতা তার সন্তানকে দেখল তখন তার দিকে ধেয়ে গেল। একটি লাঠি দিয়ে তার মাথায় ও মুখে এমনভাবে আঘাত করল যে, লাঠি ভেঙে গেল। তারপর সে ক্রোধে চিৎকার করে বলল : 'তুমি মুহাম্মাদকে অনুসরণ করা শুরু করেছ, যখন তুমি দেখছ যে, সে একটি নতুন ধর্মসহযোগে কুরাইশ গোত্রের বিরুদ্ধে উত্থান করেছে, যে ধর্ম সে এনেছে এবং তাদের উপাস্য ও পূর্বসূরিদেরকে মন্দ বলছে?'

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী খালিদ ভয় ও দ্বিধাহীনভাবে জবাব দিলেন : 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর আহ্বানে সত্য ও সঠিক এবং এ কারণেই আমি তাঁকে অনুসরণ করছি।' খালিদের পিতা ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলল : 'তুমি যেখানে খুশী যেতে পার, আমি আজ থেকে তোমাকে ত্যাজ্য করলাম। তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না।' খালিদ বললেন : 'যদি আপনি আপনার খাদ্য ও পানি বন্ধ করে দেন তাহলে আমার কোন ক্ষতি হবে না, কারণ, আল্লাহ আমাকে খাদ্য দেবেন ও আমার জীবন ধারণের ব্যবস্থা করবেন।' এই কথোপকথনের পর, তাঁর পিতা তার অন্য সন্তানদের নির্দেশ দিল তাঁকে বন্দি করার। তারা তাঁকে বন্দি করল। সেখানে তিনি উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে তিনদিন খাদ্য ও পানি ছাড়া বন্দি অবস্থায় ছিলেন যতক্ষণ না তিনি সেখানে থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁর পিতা তার সন্তানদের নির্দেশ দিল : 'যে খালিদের সাথে কথা বলবে তারও একই পরিণতি হবে।' একারণে খালিদ তাঁর পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মহানবী (সা.)-এর নিকট আশ্রয় নেন। এরপর থেকে তিনি সবসময়ই রাসূলের পাশে থাকতেন।

খালিদের ইসলাম গ্রহণের কথা যখন সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল তখন কেবল তাঁর পিতাই নয় যে তাঁকে হুমকি প্রদান করে এবং তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করে, বরং

কুরাইশ গোত্রের নেতারাও তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে খারাপ আচরণ শুরু করে। কিন্তু খালিদ সকল ধরনের চাপ উপেক্ষা করেন এবং ইসলামের শত্রুদের শত্রুতা প্রতিহত করেন।

একদিন আবু সুফিয়ান খালিদকে দেখে বলল : 'হে খালিদ! মুসলমান হয়ে তুমি তোমার পরিবারকে সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছ।' খালিদ জবাব দিলেন : 'আপনি ভুল বলছেন। একজন মুসলমান হয়ে আমি আমার পরিবারের মর্যাদার ভিত্তিকে শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ করেছি।' আবু সুফিয়ান এমন ধারালো উত্তরের জন্য কখনই প্রস্তুত ছিল না। সে খালিদকে হুমকি দিয়ে বলল : 'তুমি একজন যুবক ও অপরিপক্ব ব্যক্তি। আমি জানি যে, যদি তোমাকে অল্প পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়া যায় তাহলে তুমি তোমার বিশ্বাস থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।'- তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৪, উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২

বিভিন্ন দৃশ্যপটে ও ঘটনায় খালিদের উপস্থিতি

ইসলাম গ্রহণের পর খালিদ প্রতিটি ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আমরা সেগুলো থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করব।

ইথিওপিয়ায় হিজরত

যখন মুশরিক ও মূর্তিপূজকরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন যাতে তাঁরা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন এবং সেখানকার ন্যায়পরায়ণ বাদশা নাজ্জাশীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে মুসলমানদের একটি দল ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর মক্কাবাসী সম্পর্কে একটি মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কার অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে। এটি শুনে হিজরতকারীদের একটি দল মক্কায় ফিলে আসে। কিন্তু মক্কায় ফিরে গুজবের ব্যাপার জানতে পেরে তাঁরা আবার ইথিওপিয়ায় ফিরে যান।

এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় হিজরত নামে পরিচিত। খালিদ তাঁর স্ত্রী ও ভাইসহ হাবাশায় হিজরত করেন। তাঁরা সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন এবং খায়বার বিজয়ের পর মদীনায় তারা গমন করেন।

মহানবী (সা.)-এর সচিব

খালিদ ইবনে সাইদ মহানবী (সা.)-এর অন্যতম সচিব ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর অনেক চিঠি, যেগুলো মহানবী (সা.) বিভিন্ন গোত্রের প্রতি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরণ করতেন সেগুলো মহানবী (সা.) মুখে বলতেন আর খালিদ সেগুলোকে হাতে লেখে প্রেরণ করতেন। এটি হযরত খালিদের মহান ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য যথেষ্ট। খালিদের হস্তলিখিত চিঠির মাধ্যমে অনেক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে সাকিফ গোত্রের নাম উল্লেখ করা যায়।

ইয়েমেনের দায়িত্বশীল

খালিদ মহানবী (সা.) কর্তৃক ইয়েমেনে ট্যাক্স কালেকটরের দায়িত্ব লাভ করেন। যখন তিনি ইয়েমেনে গমন করেন তখন মহানবী (সা.) তাঁকে নির্দেশ দেন : 'যখন তুমি কোন আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যাবে এবং তাদেরকে আযান দিতে দেখবে তাদের ওপর অত্যাচার করবে না। অন্যদিকে যখন তুমি এমন কোন গোত্রের পাশ দিয়ে যাও যারা আযান উচ্চারণ করে না, তাহলে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে।'

খালিদ মহানবী (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

আলী (আ.)-এর সাথে

হযরত খালিদ সবসময় রাসূলুল্লাহ ও তাঁর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। তিনি হযরত আলী ও আহলে বাইত সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন।

উপসংহার

খালিদ এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি ঘরে বসে থাকার লোক ছিলেন না। তিনি ইসলামের সমৃদ্ধির জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর দেহ ও অন্তর দিয়ে সক্রিয় ছিলেন, প্রতিটি যুদ্ধে এবং সবসময় তাঁর জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরি ছিলেন। সর্বশেষ যে যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন তা ছিল 'মারজ আল সাফফার' নামক স্থানে। এই যুদ্ধের আগের রাতে খালিদ একটি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি শহীদ হতে চলেছেন। তিনি এই স্বপ্ন অন্যদের কাছে বর্ণনা করেন। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে তিনি শহীদ হন। এই যুদ্ধ রোমান ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত হয়।- তারিখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৮০, ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২

সংকলন ও অনুবাদ : মিকদাদ আহমেদ
(জাভা'নানে নামুনেয়ে সাদরে ইসলাম গ্রন্থ থেকে সংকলিত)
(চলবে)

আপনার জিজ্ঞাসা

আপনার জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন : ইসলামে যুদ্ধের বিষয়টি কি ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়? পবিত্র কোরআনের যুদ্ধ সংক্রান্ত শর্তহীন ও শর্তযুক্ত আয়াত থেকে কিভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে?

উত্তর : খ্রিস্টজগৎ তাদের ধারণা মতে ইসলামের একটি দুর্বলতা হিসেবে 'যুদ্ধ' এর বিষয়টি উত্থাপন করেছে। তারা বলে যে, ইসলাম হচ্ছে যুদ্ধ-বিগ্রহের ধর্ম– শান্তির ধর্ম নয়, অন্যদিকে খ্রিস্টবাদ হচ্ছে শান্তির ধর্ম। খ্রিস্টবাদের মতে, যুদ্ধ সামগ্রিকভাবেই মন্দ বিষয় আর শান্তি হচ্ছে সর্বদাই ভালো ও কল্যাণকর। তাই প্রতিটি ঐশী ধর্মকে অবশ্যই শান্তির পক্ষে এবং যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলতে হবে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও খ্রিস্টবাদ তাদের জন্য নির্ধারিত নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করত। তাদের সেই 'নৈতিকতার আদর্শ'টি 'অন্য গালটি এগিয়ে দেয়া'র স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের নৈতিক আদর্শ ছিল মূলত দুর্বলতা ও হীনতা প্রদর্শনের নৈতিকতা। অবশ্য বর্তমানে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। তারা এখন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করছে, তারা বিভিন্ন মাধ্যমে বিশ্বজোড়া প্রচারনা চালাচ্ছে। প্রচারনার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা। তারা এখন বলছে যে, যুদ্ধ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, জাতীয়তা সবকিছুই যুদ্ধের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমরা মুসলমানরা এগুলোকে উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে থাকি 'নৈতিক দৃষ্টিকোণ ও নৈতিক মান' এবং 'মানবিক অধিকার ও নতুন মানবিক মান' এর দৃষ্টিকোণ। সবদিক থেকেই আমি পূর্বের আলোচনায় এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছি। এটা সুস্পষ্ট যে, খ্রিস্টানদের এ বক্তব্য মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।

অবশ্য 'শান্তি' ভালো ও কল্যাণকর, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও আগ্রাসন চালানোর জন্য যে যুদ্ধ পরিচালিত হয়, জাতিসমূহের ভূমি দখল, তাদের সম্পত্তি গ্রাস ও মানুষকে দাসে পরিণত করা ও আগ্রাসী শক্তির আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে– যা কোনক্রমেই আগ্রাসী শক্তির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় না, তা অবশ্যই নিঃসন্দেহে একটি মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ। মূলত যা সীমা লঙ্ঘন ও আগ্রাসন তাই মন্দ। যুদ্ধ আগ্রাসন হতে পারে আবার আগ্রাসনের জবাবও হতে পারে। কেননা, কখনও কখনও আগ্রাসনের জবাব শক্তির মাধ্যমে দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে। এমন অবস্থাও সৃষ্টি হয় যে, শক্তিই শুধু জবাব হতে পারে।

কোন ধর্ম যদি সমাজের জন্য হয়ে থাকে তবে অবশ্যই আগ্রাসন বা আক্রমণের মোকাবেলায় কী করতে হবে এ ব্যাপারে তাকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। শুধু নিজেরা আক্রমণের সম্মুখীন হলেই নয়, বরং অন্য লোকেরাও আক্রমণের সম্মুখীন হলে কী করণীয়, ধর্মকে এ ব্যাপারেও পথনির্দেশ দিতে হবে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে ধর্মে অবশ্যই যুদ্ধের বিধান বা জিহাদের সুযোগ থাকতে হবে। খ্রিস্টবাদ বলে যে, 'শান্তি ভালো ও কল্যাণকর', আমরাও তা স্বীকার করি যে, শান্তি নিঃসন্দেহে ভালো।

কিন্তু আত্মসমর্পণ, অবমাননা ও দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে কী বলা হবে? যদি দুটি শক্তি একে অপরের মোকাবেলায় শান্তি চায়, কেউ কারো ওপর আক্রমণ করার বা চড়াও হওয়ার ইচ্ছা না করে এবং উভয়ই যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে আগ্রহী হয়, একে অন্যের অধিকার ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তখনই তাকে শান্তি বলা যেতে পারে। আর সেই ধরনের শান্তি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু যদি কখনও এক দল আক্রমণ চালায় আর অন্য দলটি 'যুদ্ধ খুবই খারাপ'– এ কারণে আত্মসমর্পণের ও নতি স্বীকারের পথ বেছে নেয় তাহলে তা হবে চরম অবমাননা ও চাপানো আগ্রাসনের প্রতি সহনশীলতা। এর নাম শান্তি নয়। এ হচ্ছে অবমাননা, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাকে মেনে নেয়া। শক্তির মোকাবেলায় এ ধরনের নতি স্বীকার কখনও শান্তি হতে পারে না।

শান্তির স্লোগান আর নতি স্বীকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম কখনও এধরনের অবমাননা-লাঞ্ছনাকে মেনে নিতে অনুমতি দেয় নি, যদিও ইসলাম শান্তির অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রবক্তা।

আমি বিষয়টির গুরুত্ব জোর দিয়েই উল্লেখ করতে চাই। কেননা, খ্রিস্টানরা ও অন্যরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারনা চালানোর হাতিয়ার হিসেবে এ বিষয়টিকে গ্রহণ করেছে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন থেকে এ কথা প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে যে, ইসলাম তরবারির ধর্ম। তারা এ পর্যন্তও বলেছে যে, মুসলমানরা মানুষকে তরবারি ধরে বলত যে, 'ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় মৃত্যুবরণ কর।' মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ জন্যই এ বিষয়ে বিস্তারিত ও সুষম দিকগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন। এ আলোচনায় শুধু কোরআনের আয়াতই প্রয়োগ করা হবে না; বরং সহিহ হাদিস ও রাসূল (সা.)-এর জীবনের ঘটনা প্রবাহেরও সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

যুদ্ধ সংক্রান্ত শর্তহীন আয়াত

কাফেরদের বিরুদ্ধে পূর্বেই আমি যুদ্ধ সংক্রান্ত কোরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করেছি যেগুলো হচ্ছে শর্তহীন আয়াত, যার অর্থ হচ্ছে– 'হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর'। অথবা আর একটি আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায় যাতে বলা হয়েছে– 'মুশরিকদেরকে যে সময় (চার মাস) দেয়া হয়েছে সে সময়ের মধ্যে যদি তারা ইসলাম কবুল না করে বা মক্কা ছেড়ে চলে না যায় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।' অথবা আহলে কিতাব সম্পর্কিত যে আয়াতটি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছি তার কথা উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়াও আর একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন 'হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং কঠোরতা প্রদর্শন কর।' (৯:৭৩)।

এখন যদি আমরা সবগুলো আয়াত সামনে রাখি তাহলে আপাতদৃষ্টিতে এ কথা বলা যায় যে, মুসলমানদেরকে সবসময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে, কাফের ও মুনাফেকদের সাথে কোন প্রকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলবে না। তাদের সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি এভাবেই চিন্তা করি তাহলে একথা বলা যায় যে, কোরআন কোন শর্ত ছাড়াই অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে।

অবশ্য আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যখন শর্তহীন ও শর্তযুক্ত উভয় ধরনের নির্দেশ পাওয়া যায় অর্থাৎ একটি স্থানে যদি শর্তহীন নির্দেশ আর অন্য একটি স্থানে যদি শর্তযুক্ত নির্দেশ থাকে তাহলে আলেমদের মতে, শর্তহীন নির্দেশকে শর্তযুক্ত নির্দেশের

আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। একটু আগে যে আয়াতটি আমি উল্লেখ করেছি তা একটি শর্তহীন আয়াত। অন্য অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো হচ্ছে শর্তযুক্ত। সেগুলোর আসল অর্থ হচ্ছে অনেকটা এরকম : হে মুসলমানগণ! মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেহেতু তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তোমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' এখন এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোরআনের যেসব স্থানে বলা হয়েছে, 'হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর', তার অর্থ হচ্ছে ঐসব কাফের ও মুনাফেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে; যতক্ষণ তারা যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে ততক্ষণ আমরাও যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

শর্তযুক্ত আয়াত

পবিত্র কোরআন সূরা বাকারায় আমাদের বলছে, 'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং সীমা লঙ্ঘন কর না, আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।'

'হে ঈমানদারগণ; তোমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর' অর্থাৎ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। কেননা, তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তবে অবশ্যই সীমা লঙ্ঘন করবে না। এর অর্থ কী? সীমা লঙ্ঘন না করার তাৎপর্যই বা কী? স্বাভাবিকভাবেই এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শুধু তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ কর, অন্য কারো সঙ্গে নয় এবং এ যুদ্ধ করতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্থাৎ বিশেষ একটি দলের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হবে যাদেরকে অপর পক্ষ যুদ্ধে পাঠাবে, যারা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হয়ে ময়দানে এসেছে এবং যারা যুদ্ধ করছে তাদের সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। তাদের মোকাবেলায় নিজেরা মুরগির মতো নতি স্বীকার করলে চলবে না, পালালে চলবে না।

আমাদেরকে অবশ্যই তরবারি উত্তোলন করতে হবে। গুলি বিনিময় করতে হবে এবং যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, যারা সৈনিক নয়, যেমন বৃদ্ধ নারী-পুরুষ, বস্তুত সকল নারী– তারা বৃদ্ধ হোক আর না হোক এবং যারা শিশু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। তদুপরি আমাদেরকে যে সমস্ত কার্যকলাপ সীমা লঙ্ঘন ও অন্যায় বলে বিবেচিত, যেমন গাছ কেটে ফেলা (অর্থাৎ তাদের অর্থনৈতিক সম্পদ বিনষ্ট করে ফেলা), তা পরিহার করতে হবে। তাদের খালও বন্ধ করা যাবে না। অন্যথায় এগুলো

হবে সীমা লঙ্ঘন ও অপরাধ। এখানে এ ভুল ধারণা করা উচিত নয় যে, যুদ্ধ করতে হলে কখনও কখনও বাড়িঘর, গাছপালা ধ্বংস করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রেও কি তা করা যাবে না? যে সমস্ত ক্ষেত্রে এ ছাড়া যুদ্ধই করা যায় না সেখানকার কথা স্বতন্ত্র এবং তখন এ জাতীয় কার্যকলাপ যুদ্ধেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সূরা হজের আয়াতটিও একটি শর্তযুক্ত আয়াত। বস্তুতপক্ষে সূরা হজের আলোচ্য পাঁচ-ছয়টি ধারাবাহিক আয়াতের প্রথম আয়াতটি হচ্ছে জিহাদ সংক্রান্ত। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, যেহেতু অন্য পক্ষ আমাদের ওপর তলোয়ার উত্তোলন করেছে কাজেই আমাদেরকে এই কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সূরা তওবার আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যেমন করে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।' (৯:৩৬)

মযলুমের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ

উপরিউক্ত আয়াতটি ও অন্যান্য আয়াত বিশ্লেষণ করার পূর্বে ভিন্ন আর একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমি আগেই বলেছি যে, যুদ্ধের অনুমতি কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে দেয়া হয়েছে। সে শর্তগুলো কী? একটি শর্ত হচ্ছে, যেমন বিরোধী পক্ষ যুদ্ধ করতে চাইলে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলে তখন অবশ্যই আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। জিহাদ করার শর্ত কি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না কি অন্যান্য কারণও রয়েছে? হতে পারে যে, অন্য পক্ষ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইল না, আক্রমণ করল না, কিন্তু তারা মানবজাতির অন্য একটি জনগোষ্ঠীর ওপর যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ শুরু করল এবং তাদের অত্যাচারের হাত থেকে ঐ নিপীড়িত জনতাকে বাঁচানোর মতো শক্তিও আমাদের রয়েছে, এমন অবস্থায় যদি আমরা তাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা না করি তাহলে কার্যত ঐ উৎপীড়িতদের বিরুদ্ধে উৎপীড়ককে মূলত সাহায্য করা হয়। আমরা এমন এক অবস্থা অবলোকন করতে পারি যে, কোন গোষ্ঠী হয়তো আমাদেরকে আক্রমণ করে নি, কিন্তু তারাই অন্য কোন জনগোষ্ঠীর ওপর অন্যায় ও যুলুমের আচরণ করেছে এবং এ মযলুম জনগোষ্ঠী মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও হতে পারে। যদি তারা মুসলিম হয়, যেমন আজকে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা, যারা নিজেদের আবাসভূমি ও বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে, যাদের সহায়-সম্পদ সব কেড়ে নেয়া হয়েছে, যাদের ওপর সব ধরনের অন্যায় করা হয়েছে, যদিও যালেমদের এ মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে

আক্রমণের কোন ইচ্ছে নেই, এমন পরিস্থিতিতে কি ঐসব মযলুম মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা বৈধ না অবৈধ?

যদি তারা মুসলিম হয় তাহলে অবশ্যই তা বৈধ। প্রকৃতপক্ষে তা বৈধই নয়; বরং বাধ্যতামূলক, এমন সহায়তা কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করা নয়; বরং মযলুমদেরকে যুলুমের যাঁতাকল থেকে উদ্ধারেরই সংগ্রাম।

কিন্তু মযলুম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি মুসলমান না হয় তাহলে কী ভূমিকা পালন করতে হবে? অত্যাচার ও যুলুম দু'ধরনের হতে পারে। কখনও এমন হতে পারে যে, কোন অত্যাচারী কোন জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সারা দুনিয়া জুড়ে তার বাণী প্রচারের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু তা নির্ভর করছে প্রচারের স্বাধীনতার ওপর।

ধরুন কোন সরকার ইসলামের দাওয়াত দানকারী মুসলমানদেরকে বলল যে, 'তোমরা যা বলছ তা বলার অধিকার নেই এবং আমরা তা করতে অনুমতি দেব না।' এমন অবস্থায় ঐ জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় নি বা ঐ জাতির জনগণের সাথে যারা সচেতন ও সত্য অবহিত নয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ঐ দুর্নীতিবাজ ও যালেম সরকারের বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে, যে তার বিকৃত মতবাদ ও ব্যবস্থা দ্বারা জনগণের ওপর বন্দিদশা চাপিয়ে দিয়ে, তাদেরকে অন্ধ সংকীর্ণতায় নিক্ষিপ্ত করে, সত্যের আওয়াজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা ও যুলুমকে টিকিয়ে রাখতে চায়? যারা সত্যের পথে চরম বাধা সৃষ্টিকারী ঐসব বাধা দূর করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কি কোন অনুমতি নেই? ঐসব অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কি বৈধ নয়? ইসলামের দৃষ্টিতে তা নিঃসন্দেহে বৈধ। কেননা, এধরনের যুদ্ধ মূলত যুলুমের ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সংগ্রাম। হতে পারে মযলুম জনতা অন্যায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তারা কোন সাহায্যের জন্য আবেদন জানায় নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহায্যের জন্য আবেদনের প্রয়োজন নেই। সাহায্যের জন্য আবেদন আর একটি বিষয়। মনে করুন, মযলুম জনগোষ্ঠী আমাদের কাছে সাহায্য কামনা করল। এখন কি তাদেরকে সাহায্য করা আমাদের জন্য বৈধ অথবা অপরিহার্য? এমনকি তারা যদি সাহায্যের আবেদন না-ও জানায় তখনও তাদেরকে সাহায্য করা কি বৈধ এমনকি বাধ্যতামূলক? এর জবাব হচ্ছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে সাহায্যের জন্য

তাদের আবেদনের দরকার নেই। সরল কথা হচ্ছে যে, মযলুমরা মযলুমই এবং যালেম সরকার একটি জাতির কল্যাণের পথে, তাদের সচেতন হওয়ার পথে, যে সত্য তাদের জাতীয় জীবনে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এনে দিতে পারত সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পথে তীব্র বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, দাঁড় করিয়েছে এক কঠিন দেয়াল। আমাদেরকে এ বাধার দেয়াল গুঁড়িয়ে দিতে হবে, উৎখাত করতে হবে ইসলাম ও মযলুম জনগণের মধ্যে বাধা সৃষ্টিকারী ঐ অত্যাচারী সরকারকে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উপরিউক্ত কারণে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মুসলমানরা যুদ্ধে গিয়ে একথা বলতেন যে, পৃথিবীর জনগণের সাথে কোন যুদ্ধ ও সংঘাত নেই; বরং তাদের মুক্তি কল্পেই ঐসব সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করছেন– যে সরকারগুলো তাদের ওপর দুঃখ-কষ্ট ও দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। যখন প্রাক-ইসলামি যুগের পারস্যের বীর সেনানায়ক রুস্তম মুসলমান সৈনিকদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাঁদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী? তখন তাঁরা বলেছিলেন, 'মানুষকে মানুষের দাসত্ব, আনুগত্য ও ইবাদতের হাত হতে উদ্ধার করে আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত করা।' অর্থাৎ আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে মুক্ত করা যাদেরকে তোমরা তোমাদের প্রতারণা ও শক্তি দ্বারা দাসত্বের জোয়ালে শৃঙ্খলিত করে রেখেছ। আমরা এসেছি তাদেরকে তোমাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। আমরা চাই তাদেরকে মুক্ত করে কোন সৃষ্টির আনুগত্যের পরিবর্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দায় পরিণত করতে।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রগুলোতে তিনি বিশেষভাবে পবিত্র কোরআনের এ আয়াত উল্লেখ করতেন : 'বল, হে আহলে কিতাব! এস এমন একটি কথার ওপর যা আমাদের ও তোমাদের উভয়ের জন্য সমান আর তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করব না, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করব না এবং আমরা একে অন্যকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না।' (৩:৬৪) এ আয়াত স্পষ্টভাবে নবী (সা.)-কে বলে দিচ্ছে যে, আহলে কিতাবদের (যাদের সম্পর্কে জিহাদের নির্দেশও দেয়া হচ্ছে) এমন একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাতে হবে যা তাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য সমান। এমন কথা গ্রহণ করতে কোরআন বলছে না যা শুধু আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং শুধু আমাদের সঙ্গেই

সংশ্লিষ্ট। তার আহ্বান সবারই জন্য কল্যাণকর এবং সবার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গ্রহণ করা।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা কউকে বলি : 'এস এবং আমদের ভাষা গ্রহণ কর।' তখন ঐসব লোকের অবশ্যই অধিকার রয়েছে একথা বলার যে, 'কেন? আমাদের নিজেদেরই তো একটি ভাষা রয়েছে। এরপর তোমাদেরটা গ্রহণ করতে যাব কেন?' যদি আমরা বলি, 'এস, আমাদের বিশেষ অভ্যাস ও রীতি-প্রথাকে গ্রহণ কর।' তারা তখন বলতে পারে, 'কেন আমরা অভ্যাস ও রীতি গ্রহণ করব যেখানে আমাদের নিজস্ব অভ্যাস ও রীতি রয়েছে?' কিন্তু যদি আমরা বলি, 'এস, এমন একটি বিষয় আমরা গ্রহণ করি যা শুধু আমাদেরও নয়, তোমাদেরও নয়, বরং প্রত্যেকেরই, আল্লাহ্ আমাদের সবার আল্লাহ, অতএব, তাঁকে গ্রহণ কর'– একথা শুধু আমাদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়। যখন আমরা বলি, 'শুধু তাঁরই আনুগত্য ও ইবাদত কর যিনি তোমাদের-আমাদের, বরং সবারই সৃষ্টিকর্তা।' এ বিষয়টি আমাদের সবার জন্যই সমান। পবিত্র কোরআন বলছে, 'এস এমন একটি বিষয়ের দিকে যা আমাদের ও তোমাদের জন্য সমান।' একমাত্র আল্লাহ্ই, যাঁর ইবাদত করা চলে, দাসত্ব করা চলে।

আর একটি বিষয়ও রয়েছে যা তোমাদের ও আমাদের উভয়ের জন্য পরম কল্যাণকর ও লাভজনক। আর তা হচ্ছে 'আমরা একে অন্যকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না', যার অর্থ হচ্ছে 'প্রভু-দাস'– এ সামাজিক নিয়ম ও ধারা বাতিল হয়ে গেল এবং মানুষে মানুষে সাম্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত হলো।

এ আয়াত স্পষ্ট করেই বলছে যে, আমরা যদি যুদ্ধ করি তাহলে যুদ্ধ করতে হবে এমন বিষয়ের জন্য যা সমস্ত মানবজাতির জন্যই সমান। ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন আমরা বলতে পারি, যুদ্ধের অন্যতম শর্ত হিসেবে শর্তহীন আয়াতগুলোতে প্রয়োগযোগ্য শর্ত হচ্ছে যে, যে সমস্ত জনগৌষ্ঠী যুলুম-অত্যাচারের সম্মুখীন তাদেরকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি আমাদের জন্য রয়েছে।

এখন আমি আরো দুটি আয়াতের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে সূরা আনফালের ৩৯ নং আয়াত : 'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেতনা দূর হয়ে যায় এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র জন্যই হয়ে যায়।'

এ আয়াতের অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে, যারা আমাদের মধ্যে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদেরকে আমাদের ধর্ম হতে ফিরিয়ে নিতে চায় আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে হবে। আমাদেরকে ঐসব ফেতনা ও নৈরাজ্য দূর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে। এটি জিহাদের একটি শর্ত। আর একটি সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে : 'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং ঐসব মুস্তাযআফীন পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যুদ্ধ করছ না...' অর্থাৎ হে মুসলিম! তোমরা কেন আল্লাহর পথে ও ঐসব অসহায় লোকের খাতিরে লড়াই করছ না? যেখানে পুরুষ, নারী ও শিশুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে আছে, সেখানে তোমরা তাদের জন্য কেন যুদ্ধ করছ না? তাদের মুক্তিকল্পে কেন তোমরা যুদ্ধ করছ না?

শর্তহীন আয়াতসমূকে শর্তযুক্ত আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা

উপরিউক্ত পাঁচটি আয়াত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, জিহাদ সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশাবলি কোথাও শর্তহীন আর কোথাও শর্তযুক্ত। এমন অবস্থায় জ্ঞানী ও আলেমগণের মতে শর্তহীন আয়াতগুলোকে শর্তযুক্ত আয়াতের আলোকেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই

পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে– ধর্ম মানুষ গ্রহণ করবে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে– জোর-জবরদস্তির কারণে নয়। এগুলো থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ এই নয় যে, লোকদের ওপর আমরা শক্তিপ্রয়োগ করব এবং বলব যে, হয় মুসলমান হতে হবে, নতুবা মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ সমস্ত আয়াত মূলত শর্তহীন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা।

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের 'আয়াতুল কুরসি'র (২:২৫৫২৫৭) একটি খুবই পরিচিত 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন, ক্বাদ তাবাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়্যি' অর্থাৎ ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, কেননা, সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে– এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে যে, আমরা মানুষের নিকট সত্য ও সঠিক পথকে স্পষ্ট করে তুলে ধরব, তার বাস্তবতাকে প্রকাশ করে দেব। ধর্মে জোর-জবরদস্তি করার কোন সুযোগ নেই– জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানোও যেতে পারে

না। এ আয়াতটি বক্তব্যের দিক থেকে পবিত্র কোরআনের একটি স্পষ্ট আয়াত। কোরআনের বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন আনসারের দু'জন পুত্র ছিল যারা পূর্বে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ দু'পুত্র খ্রিস্টধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে এবং এর জন্য নিষ্ঠাবান হয়ে যায়। এখন তাদের পিতা মুসলমান হয়েছে এবং তিনি তার পুত্র খ্রিস্টান হওয়ার কারণে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন : 'হে রাসূলুল্লাহ্! আমি আমাদের দু'সন্তান সম্পর্কে কী করতে পারি যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে? যতই আমি চেষ্টা করেছি তারা মোটেই ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। আপনি কি আমাকে এ অনুমতি দেবেন যে, আমি শক্তি প্রয়োগে তাদেরকে ধর্মত্যাগ করতে ও মুসলমান হতে বাধ্য করব?' নবী (সা.) বললেন : 'না, লা-ইকরাহা ফিদ্দীন'– ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই।

যেসব পটভূমিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল তাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় মদীনায় বাস করত এবং তারাই ছিল মদীনার অধিবাসী। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তারা কতিপয় ইহুদি গোত্রের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করত। ঐসব ইহুদি গোত্র পরবর্তীকালে মদীনায় আসে। গোত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল বনি নাযল অপরটি ছিল বনি খারেজা। তাছাড়াও অন্য আর একটি বড় ইহুদি গোত্র বাস করত।

ইহুদিরা ইহুদিবাদ ও একটি ঐশী গ্রন্থের অধিকারী হওয়ার কারণে সে সমাজের শিক্ষিত হিসেবে কম-বেশি সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ছিল। অন্যদিকে মদীনার আদি অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক এবং নিরক্ষর। অবশ্য তাদের মধ্যে একটি ছোট্ট দল লেখাপড়া জানত। ইহুদিরা তাদের উন্নতি, সংস্কৃতি, প্রসারিত চিন্তাধারার কারণে মদীনার মূল অধিবাসীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। আউস এবং খাজরাজ গোত্রের ধর্ম ইহুদিদের চেয়ে ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও ধ্যান-ধারণা ও ভাবধারা দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিল। ফলশ্রুতিতে তারা কখনও কখনও তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ইহুদিদের নিকট লেখাপড়া করতে পাঠাত এবং ইহুদিদের পরিবেশ থেকে ঐসব সন্তান পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদি হয়ে যেত। যখন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মদীনায় আসলেন, তখন এসব ছেলের একটি অংশ ইহুদিদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছিল এবং তারা ইহুদি ধর্মকে তাদের জন্য পছন্দ করে নিয়েছিল।

অবশ্য এক অংশ স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগে রাজি ছিল না। এখন পিতা-মাতারা ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এসব সন্তান ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করতে রাজি হলো না। যখন এটি সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহুদিদেরকে (তাদের নৈরাজ্য সৃষ্টি ও ষড়যন্ত্রের কারণে) মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে তখন ঐসব সন্তানও তাদের ইহুদি সঙ্গীদের সঙ্গে চলে যায়। তাদের পিতারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসলেন এবং তাদের সন্তানদেরকে ইহুদিদের থেকে পৃথক করে দিতে এবং তাদেরকে ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে এ অনুমতি দেন নি। তাঁরা বলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্! আমাদেরকে অনুমতি দিন যেন আমরা তাদেরকে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারি।' মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন : 'না, যখন তারা ইহুদিদের সঙ্গে যাওয়াটাই পছন্দ করেছে তখন তাদেরকে তাদের সঙ্গে যেতে দাও।' মুফাস্সিরগণ বলেন যে, তখনই এ আয়াত নাযিল হয়, 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন, ক্বাদ তাবাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়্যি।'

অন্য একটি প্রসিদ্ধ আয়াত হচ্ছে : 'তোমার রবের দিকে ডাক হিকমত ও সদুপদেশ সহকারে এবং উত্তমভাবে তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর।' (১৬:১২৫)

লোকদেরকে তাদের রবের পথে আহ্বান জানাও। কিন্তু কিভাবে, শক্তি প্রয়োগ করে? 'উত্তম নসিহত সহকারে এবং সুন্দরভাবে তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর...', যারা আমাদের সঙ্গে মতবিরোধ করবে তাদের সঙ্গে উত্তমভাবেই মতবিরোধ কর। একইভাবে এ আয়াতে ইসলামের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থাও বলে দিচ্ছে।

অন্য আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে, এখন যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করুর আর যার ইচ্ছা একে প্রত্যাখ্যান করুক।' (১৮:২৯) যে ঈমানদার হতে চায় সে ঈমানদার হবে আর যে কাফের হতে চায় সে কাফের হবে। এ আয়াতও এটিই বলে দিচ্ছে যে, বিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান ঈমান ও কুফ্র ব্যক্তি নিজেই বাছাই করবে, এগুলো জোর করে কারও ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। অতএব, ইসলাম কাউকে জোর করে ইসলামে দাখিল করতে বলে না। যদি কেউ মুসলিম হতে চায় এটি ভালো, কিন্তু যদি কেউ মুসলমান না হতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা চলবে না। কারণ, গ্রহণ করা না করা তাদের পছন্দের ব্যাপার। ইসলাম বলছে, যে কেউ ঈমানদার হতে চায় তা করতে পারে আবার যে কেউ করতে না চায় তাও পারে।

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমার রবের ইচ্ছাই যদি এই হতো (যে, যমিনের সব মানুষই মুমিন ও অনুগতই হবে) তাহলে দুনিয়ার সব অধিবাসীই ঈমান আনত। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে?' এ আয়াতে নবী করিম (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে।

মহানবী (সা.) সত্যিকারভাবে মানুষকে ভালোবাসতেন এবং তারা সত্যিকার ঈমানদার হোক তা তিনি চাইতেন। পবিত্র কোরআন বলছে যে, ঈমানের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ অর্থহীন। যদি শক্তি প্রয়োগ করা সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর সৃষ্ট ক্ষমতা বলে সমস্ত মানুষকে ঈমানদার বানাতে পারতেন। কিন্তু ঈমান এমন এক বিষয় যা মানুষ নিজেই বাছাই করবে। অতএব, যে কারণে আল্লাহ্ তার সৃষ্ট ক্ষমতা বলে জোর করে মানুষকে ঈমানদার হতে বাধ্য করেন নি, বরং তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন যে কোন একটি বাছাই করার জন্য, ঠিক সে কারণেই নবী (সা.)-এর উচিত মানুষকে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া। যার ইচ্ছে ঈমানদার হবে, যার ইচ্ছে হবে না।

অন্য একটি আয়াতে নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : 'তুমি হয়তো এ চিন্তায় প্রাণ বিনষ্ট করে দেবে যে, এ লোকেরা ঈমান আনছে না।' (২৬:৩) 'হে নবী! মনে হচ্ছে তুমি যেন তারা ঈমান গ্রহণ করছে না এ চিন্তায় নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ। তাদের জন্য এতটা চিন্তিত হয়ো না। যদি সৃষ্ট ক্ষমতা বলে জোর করেই ঈমান গ্রহণ করাতে চাইতেন তাহলে আল্লাহ অতি সহজেই তা করতে পারতেন।' 'আমরা চাইলে আকাশ হতে এমনসব নিদর্শন নাযিল করতে পারি যার সম্মুখে তাদের মাথা নত হয়ে যাবে।' (২৬:৪) এখানে আল্লাহ বলছেন যে, যদি তিনি আকাশ থেকে নিদর্শন পেশ করতে চাইতেন, এ শান্তি আরোপ করতে চাইতেন এবং লোকদেরকে বলতেন, 'হয় তোমরা ঈমানদার হবে নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে', তখন সমস্ত মানুষ চাপের মুখে ঈমানদার হয়ে যেত, কিন্তু তিনি তা চান না। কারণ, তিনি চান মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেরাই বাছাই করে নিক।

এ সকল আয়াত আরো পরিষ্কারভাবে জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে।

ইসলামে জিহাদের লক্ষ্য তা নয় যা একদল স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা লোক মনে করে বসে আছে। এ সমস্ত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, ইসলামের লক্ষ্য বাধ্য বা জোর করা

নয়। এটি মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছে না যে, অমুসলমানদের ওপর তলোয়ার ধরে বলতে হবে যে, 'ইসলাম, নয় মৃত্যু'– তা নয় এবং জিহাদের উদ্দেশ্য এসব কিছু নয়।

শান্তি

পবিত্র কোরআনে আরো কতক আয়াত এমন রয়েছে যার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে ইসলাম শান্তির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। একটি আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে : 'ওয়াস সুল্হু খাইরুন'– শান্তি (সন্ধি) সর্বোত্তম (৪:১২৮)। কিন্তু পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, শান্তি মানে যুদ্ধ, দুঃখ-কষ্ট ও যালেমদের নিকট আত্মসমর্পণ নয়। অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপেই শান্তির (ইসলাম) মধ্যে প্রবেশ কর।' (২:২০৮)

কিন্তু এর চেয়েও স্পষ্ট করে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে : 'যদি তারা শান্তির জন্য আগ্রহী হয় তবে তুমিও এর জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র ওপরই ভরসা কর।' (৮:৬১) এখানে নবী করিম (সা.)-কে বলা হয়েছে যে, যদি শত্রু বিরোধী পক্ষ শান্তি কামনা করে, আন্তরিকভাবে শান্তির জন্য প্রয়াসী হয়, তাহলে তাকেও শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। এ আয়াতগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই তুলে ধরছে যে, ইসলামের আত্ম মূলত শান্তিরই আত্মা।

সূরা নিসার একটি আয়াতেও নবী করিম (সা.)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে প্রত্যাহৃত হয় ও লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের দিকে শান্তির হাত প্রসারিত করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করার কোন পথ রাখেন নি।' (৪:৯১) অর্থাৎ হে নবী (সা.)! যদি তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে যায় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকে এবং যদি তারা শান্তির জন্য আগ্রহী হয় তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন না।'

একই সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, 'যদি তারা পালিয়ে যায় তাহলে যেখানে পাবে সেখানেই তাদেরকে ধরবে, হত্যা করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে না।' অবশ্য সেসব (মুনাফিক) লোক যারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সঙ্গে মিলিত হয়, যারা তোমাদের নিকট আগেও লড়াই-সংঘর্ষে উৎসাহী নয় এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়

না এবং তাদের জাতির বিরুদ্ধেও নয়।' (৪:৮৯-৯০) অর্থাৎ যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধরত মুনাফিকরা পালিয়ে যায়, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই পাকড়াও করতে হবে এবং হত্যা করতে হবে, তাদের কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না, তাদের সাহায্য-সহযোগিতাও নেয়া যাবে না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে ঐসব মুনাফিকরা যারা আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং যারা আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত। তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। এবং যারা যুদ্ধ করতে অনাগ্রহী তাদের সঙ্গেও লড়াই করা চলবে না।

অতএব, এ পর্যন্ত আমরা চার ধরনের আয়াত পাচ্ছি। এক ধরনের আয়াতে আমাদরকে শর্তহীনভাবে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যসব বাদ দিয়ে যদি কেবল এ ধরনের আয়াতই শ্রবণ করি তাহলে এটি মনে করা সম্ভব যে, ইসলাম একটি যুদ্ধেরই ধর্ম। দ্বিতীয় ধরনের আয়াতসমূহে নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তসাপেক্ষে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমন বিরোধী পক্ষ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে অথবা কোন মুসলিম বা অমুসলিম জাতি কোন গোষ্ঠী কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছে এবং কারো স্বাধীনতা ও অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তৃতীয় ধরনের আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ইসলামের বাণীর প্রচার শক্তি প্রয়োগ করে করা যাবে না। চতুর্থ ধরনের আয়াতসমূহ ইসলামের শান্তিনীতি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করেছে।

(উত্তরটি আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী প্রণীত একটি গ্রন্থ হতে সংকলিত।)